মাসুদ রানা
দুরন্ত ঈগল ১
কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

শুক্রবার, সন্ধ্যা – জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় রানওয়েতে ল্যান্ড করল একটা সিঙ্গাপুরি ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স। প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র যাচাই করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে আগেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে, মুমূর্ষু একজন রোগিণীকে সিঙ্গাপুরের 'মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটাল'-এ নিয়ে যাওয়া হবে।

সাবলীল ভঙ্গিতে নিরাপদেই ল্যান্ড করল সাদা বকের মত প্লেনটা, তারপর গড়িয়ে চলে গেল টার্মিনাল ভবনের কাছাকাছি, উজ্জ্বল আলোর মাঝখানে। সাদা গায়ে, ফিউজিলাজের দু'পাশে, একটা করে রক্তবর্ণ ক্রসচিহ্ন কার না চোখে পড়বে।

পাঁচজন ক্রু, দুজন আরদালি, দুজন নার্স ও দুজন ডাক্তার আছেন ওটায়। কাগজ-পত্র অনুসারে সবাই তাঁরা থাই নাগরিক, চেহারায় তাই জাতিগত থাই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, তবে ওঅর্ক পারমিট নিয়ে দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন। প্লেনের গায়ে, ক্রসচিহ্নের নীচে, বড় বড় নীল হরফে ইংরেজিতে লেখা: SINGAPORE FLYING AMBULANCE.

দুজন আরদালি, একজন নার্স ও দুজন ডাক্তার ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স থেকে নেমে কাস্টমস শেডের দিকে এগোলেন, রোগিণীকে আনতে বনানীর ডিপ্লোম্যাটিক জোন-এ যাবেন তাঁরা।

কাস্টমস অফিসাররা জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন,

সবার আগে চেক করে ওঁদের পাসপোর্টে সিল মেরে দিলেন, জানেন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কোমা-য় থাকা কোনও এক রোগিণীকে নিয়ে আবার ওঁরা সিঙ্গাপুরে ফেরার জন্য ফ্লাই করবেন। সবার কাছে থাই পাসপোর্ট, অথচ আসছেন সিঙ্গাপুর থেকে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ অফিসাররা জানেন, সিঙ্গাপুরের অনেক হাসপাতালে বিভিন্ন দেশের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী ওঅর্ক পারমিট নিয়ে বছরের পর বছর চাকরি করেন।

টার্মিনাল ভবন হয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল পাঁচজন থাই। রাস্তার ওপারে একটা অ্যামবুলেন্স অপেক্ষা করছে ওদের জন্য, মাথায় লাল-নীল আলো জ্বলছে আর নিভছে, গায়ে লেখা: ইমার্জেন্সি অ্যামবুলেন্স সার্ভিস, মগবাজার, ঢাকা।

পাঁচ থাই রাস্তা পেরুচ্ছে, সামনে ডাক্তার ও মেইল নার্স তিনজন, দেখতে পেয়ে দরজা খুলে অ্যামবুলেন্স থেকে নীচে নামল ড্রাইভার। তার বয়স হবে বত্রিশ। গায়ের রঙ কালো, স্বাস্থ্য ভাল। মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, গোঁফ জোড়া ঘন ও চওড়া। তার দুই গালেই গভীর ও শুকনো ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, ওগুলোর উপর দাড়ি গজায়নি – দেখা যায় পরিষ্কার।

ছোট্ট গ্রুপটা কাছাকাছি চলে আসতে অ্যামবুলেন্সের স্লাইডিং দরজা খুলে দিল সে। মাথা ঝুঁকিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করলেন ডাক্তার, আর সবাইও কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে উঠে পড়ল গাড়িতে।

নিজের সিটে উঠে দরজা বন্ধ করল ড্রাইভার। সব কটা জানালা বন্ধ, ভিতরটা এয়ারকুল্‌ড্‌। ঘাড় ফিরিয়ে থাই অতিথিদের দিকে তাকাল সে। মুখে হাসি নেই। এক ধরনের ভয় মেশানো সমীহের ভাব নিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

'আমরা থাই থান্ডার,' ডাক্তারদের ড্রেস পরা এক লোক ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল। অত্যন্ত শান্ত ও ঠাণ্ডা চেহারা তার, শুধু চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তার ডান কপালের পাশে একটা

লাল জরুল আছে। থাইল্যান্ডে থান্ডার হলো কুখ্যাত একটা মাফিয়া সংগঠন। 'আমি চিফ, চক্রি চুয়ান। আপনি কি গালকাটা রুস্তম?'

অনভ্যস্ত ইংরেজিতে বলল ড্রাইভার, 'হ্যাঁ, আমি রুস্তম।'

'কোড বলুন, প্লিজ,' চক্রি চুয়ান বলল। 'আমারটা আমি বলছি – ডাবল জিরো, ট্রিপল থ্রি।'

'ট্রিপল থ্রি, ডাবল জিরো,' নিজের কোড জানাল ড্রাইভার।

'ঠিক আছে, গাড়ি ছাড়ুন তা হলে,' বলল থান্ডার লিডার। 'শহরের ভেতর ঢুকি আগে।' রুস্তম গাড়ি ছাড়ার পর আবার বলল, 'এখানে আপনাকে কে পাঠাল? আপনার কাজটাই বা কী?' এখনও ড্রাইভার রুস্তমকে পরীক্ষা করছে সে।

'বাংলাদেশ সিন্ডিকেট থেকে আমার বস্ এখানে আমাকে পাঠিয়েছেন, মিস্টার চুয়ান,' থেমে থেমে, বুঝে-শুনে জবাব দিচ্ছে রুস্তম; বস্ তাকে সাবধানে থাকতে বলে দিয়েছে, কিছু ভুল-ভাল করে ফেললে বছরে যে কয়েক কোটি টাকার ড্রাগস আমদানির ব্যবসা হচ্ছে সেটা ওদেরকে হারাতে হতে পারে।

'আপনার বসের নাম?'

'জহুরুল আব্বাসী,' ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে রুস্তম, শান্ত ভাবে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

'আপনাকে ঠিক কী দায়িত্ব দিয়ে তিনি পাঠিয়েছেন?'

'আপনাদের সবরকম সহযোগিতা করতে বলে দিয়েছেন। যেখানে যেতে চান সেখানে নিয়ে যাব,' জবাব দিল রুস্তম, 'যাই করতে চান, সাহায্য করব আমি।' একটু থেমে গলায় একটু জোর এনে সে আবার বলল, 'আসলে আমি ড্রাইভার নই, বাংলাদেশ সিন্ডিকেটের উঁচু কোনও পদে আছি। আপনাদের কাজটা গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্যেই দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন বস্। আমার ওপর আপনারা ভরসা রাখতে পারেন।'

'নিশ্চয়ই জানেন কোথায় যেতে চাই আমরা? ভেরি গুড, নিয়ে

চলুন সেখানে।' সিটে হেলান দিল চক্রি চুয়ান।

'না, মিস্টার চুয়ান,' বলল রুস্তম। 'আপনাদের গন্তব্য বা কাজ সম্পর্কে আমাকে কোনও ধারণা দেয়া হয়নি। বস্ বলে দিয়েছেন, আমাকে শুধু আপনার নির্দেশ পালন করতে হবে।'

'কিন্তু আপনার তো জানার কথা যে আমাদের একটা মাইক্রোবাস দরকার হবে,' বলল চুয়ান।

'হ্যাঁ, জানি, মিস্টার চুয়ান,' বলল গালকাটা রুস্তম। 'মাইল দুয়েক সামনে পার্ক করা আছে ওটা, কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর সামনে। পাঁচ সিটের মাইক্রোবাস, নীল রঙের। এই নিন চাবি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার গালকাটা,' রিঙসহ চাবি নিয়ে বলল চক্রি চুয়ান।

অস্বস্তি বোধ করায় তাড়াতাড়ি তাকে শুধরে দিল রুস্তম, বলল, 'নামের সবটুকু নয়, শেষটুকু বললেই চলবে।'

'ঠিক আছ, মিস্টার কাটা মাল,' সহাস্যে বলল চক্রি চুয়ান।

'না-না, মাল নয়, মাল নয় – রুস্তম।'

'সরি,' বলল চুয়ান। ডাক্তারি ব্যাগ খুলে তুলোর একটা বড়সড় রোল ধরল সে, সেটার ভিতর থেকে বেরুল একটা প্যাকেট। 'এই টাকাটা রাখুন, আপনার বস্ মিস্টার আব্বাসীর জন্যে।'

প্যাকেটা নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল রুস্তম। 'ধন্যবাদ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা।

তারপর হঠাৎ বলল চুয়ান, 'আমরা একটা তালিকা পাঠিয়েছিলাম...'

'আপনাদের যা যা দরকার তার কিছু আছে এই গাড়িতে, বাকি সব পাবেন মাইক্রোবাসে – সিটের সাইড পকেট আর ব্যাকসিটের তলায়,' বলল রুস্তম।

কী কী আছে দেখে নিয়ে নিজের পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে চোখ বুলাল চক্রি চুয়ান। এই ম্যাপ ঢাকা থেকে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়েছে তাকে।

ম্যাপে ঢাকার ডিপ্লোম্যাটিক জোনের দুটো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা থাই দূতাবাস, অপরটি ডক্টর মির্জা শামসুন্নাহার নামে এক বাংলাদেশী ভদ্রমহিলার বসতবাড়ি – নাহার ভিলা। দুই বাড়ির মাঝখানে শুধু একটা সরু প্যাসেজ। দুই বাড়িরই পিছন দিকে প্রচুর গাছপালা রয়েছে, লক্ষ করল থাই থান্ডারের লিডার। পাঁচিল টপকানো কোনও সমস্যা নয়, ভাবল সে, কারও চোখে ধরা পড়ারও কোনও ভয় নেই।

এরপর একটা নকশা পরীক্ষা করল চুয়ান, এটাও ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে তাকে। ওটায় নাহার ভিলার কোথায় কী রয়েছে সব আঁকা আছে। ফুটনোটে বলা হয়েছে শুক্রবার ডিনারের সময় ভিলায় উপস্থিত থাকবে মাত্র পাঁচজন মানুষ।

'এবার, মিস্টার কাটা রুস্তম, আমার জানামতে আপনার কাছে একটা রেডিও সেট থাকার কথা।'

'আছে, মিস্টার চুয়ান,' বলে ড্রাইভিং সিটের পকেট থেকে মিনি সাইজের একটা রেডিও সেট বের করল রুস্তম।

সেটা নিয়ে কোলের উপর রাখল চুয়ান। মাথায় হেড সেট পরে অন করল সেটটা, নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার জন্য নব ঘোরাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই যোগাযোগ ঘটল। যান্ত্রিক হলেও, বাংলাদেশ সিন্ডিকেটের চিফ জহুরুল আব্বাসীর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার চিনতে পারল চক্রি চুয়ান, দীর্ঘদিন হলো এই লোকের সঙ্গেই ড্রাগ-এর ব্যবসা করছে ওরা। তারপরেও নিজের কোড বলল সে। 'ডাবল জিরো, ডাবল ওয়ান। আপনারটা, প্লিজ?'

'ডাবল ওয়ান, ডাবল জিরো,' আন্তরিক ও মার্জিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল খুদে স্পিকার থেকে।

'হাই!'

'হ্যালো!'

'ডক্টর 'এন' কি আজও ডক্টর 'এস'-এর বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন?' দ্রুত প্রশ্ন করল চক্রি চুয়ান।

'মিনিট বিশেক আগে রিপোর্ট পেয়েছি, ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে রওনা হয়েছেন ডক্টর এন।' আব্বাসীও দ্রুত উত্তর দিচ্ছে, দুজনের কেউই ইথারে বেশিক্ষণ থাকতে চাইছে না।

ঢাকা শহরের একটা ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছে চুয়ান। সে আন্দাজ করে নিল, এতক্ষণে ডক্টর নাদিরা নিশ্চয়ই নাহার ভিলায় পৌঁছে গেছেন। 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ওদের অ্যামবুলেন্স এরইমধ্যে কয়েকটা বাঁক নিয়েছে। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে গালকাটা রুস্তম।

হেড গিয়ার সহ রেডিও সেটটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে চুয়ান বলল, 'কী করতে হবে বলছি, মন দিয়ে শুনুন, মিস্টার কাটা রুস্তম।'

'ইয়েস, মিস্টার চুয়ান,' রাস্তার উপর চোখ রেখে বলল রুস্তম।

ব্যাক সিট থেকে তার কোলের উপর ম্যাপের ফ্যাক্স কপিটা ফেলল চুয়ান, তারপর বলল, 'মাইক্রোবাসে চড়ে হারিয়ে যাব আমরা। আপনি নাহার ভিলার আশপাশে কোথাও অপেক্ষা করবেন। যেই আমি আপনাকে জানাব সময় হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যামবুলেন্স নিয়ে নাহার ভিলার ভেতরে ঢুকে পড়বেন আপনি।'

কোল থেকে ম্যাপটা তুলে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলাল রুস্তম। 'ওই ভিলায় দারোয়ান নেই? গেট খোলা না পেলে?'

'দারোয়ান নয়, সেনাবাহিনীর সদস্যরা পাহারা দিচ্ছে বাড়িটা,' বলল চক্রি চুয়ান। 'ওদেরকে বলবেন ফোন করে

অ্যামবুলেন্স চাওয়া হয়েছে, এক্ষুনি হার্ট অ্যাটাক-এর রোগিণীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তারপর পরিস্থিতি বুঝে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে ভেতরে ঢুকবেন। আমরা বাড়ির ভেতরেই থাকব।'

সেনাবাহিনীর কথা শুনে মনে মনে ঘাবড়ে গেলেও, চেহারায় সে উদ্বেগ ফুটতে দিল না রুস্তম। মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'ঠিক আছে।'

'ভেরি গুড,' খুশি হলো চক্রি চুয়ান। 'মিস্টার কাটা রুস্তম, এবার আমার বন্ধুদের খবর বলুন। ওরা সব ভাল তো?'

'ওই পাঁচ থাই, মানে, যারা ঠিক আপনাদের মত দেখতে...' শুরু করল রুস্তম ।

'না, মিস্টার কাটা রুস্তম, তা কী করে হয় – সবাই আমরা আলাদা দেখতে।'

'আমার চোখে তো একই রকম লাগে। যাই হোক, কাল রয়াল থাই এয়ারলাইন্সের সন্ধ্যার ফ্লাইটে ভালভাবেই পৌঁছেছেন আপনার পাঁচ বন্ধু,' জানাল গালকাটা রুস্তম। 'তবে কী কাজে এসেছেন বা কোথায় উঠেছেন আমার জানা নেই। আপনাদের মত ওঁদেরকেও যা-যা চাওয়া হয়েছে দেয়া হয়েছে সব।'

'পেমেন্ট?'

'পেয়ে গেছি।'

'ভেরি গুড। স্পিড বাড়ান, মিস্টার কাটা রুস্তম,' নির্দেশ দিল চুয়ান।

স্পিড না বাড়িয়ে রুস্তম বলল, 'সামনেই বাঁক।' বাঁকটা ঘোরার পর ফুটপাথ ঘেঁষে অ্যামবুলেন্স দাঁড় করাল সে। দুশো গজ দূরে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো দেখা যাচ্ছে। সেদিকে চিবুক তাক করে বলল, 'ওই দেখা যায় আপনাদের নীল মাইক্রোবাস।'

*

সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে সাতটায় কাঁটাতারের বেড়া কেটে বিমানবন্দরের

ভিতর ঢুকল থাই থান্ডারের প্রথম গ্রুপটা। এরাও সংখ্যায় পাঁচজন, প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্রিফকেস। গালকাটা রুস্তম ও চক্রি চুয়ান এদের নিয়েই আলাপ করছিল অ্যামবুলেন্সে – রয়াল থাই এয়ারলাইন্স-এর একটা বোয়িং-এ চেপে গতকাল ঢাকায় এসেছে।

ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স ও টার্মিনাল ভবন থেকে সবচেয়ে দূরের বেড়া কেটে ভিতরে ঢুকেছে এরা পাঁচজন। চাঁদ-তারা কিছুই নেই আকাশে, বিমানবন্দরের এদিকটা অন্ধকারে ঢাকা।

বেড়া কাটবার পর তিন মিনিট হাঁটল ওরা। দুই কি আড়াইশো গজ দূরে আলোকিত একটা হ্যাঙ্গার দেখতে পেল। ওরা জানে, স্পেশাল একটা হ্যাঙ্গার ওটা। বাইরে নয়, আলো জ্বলছে হ্যাঙ্গারের ভিতরে। তবে সেই আলোর আভায় বাইরে টহলরত কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল পরিষ্কার। সামরিক বাহিনীর দুটো অস্থায়ী তাঁবুও রয়েছে হ্যাঙ্গারে ঢোকার মুখ থেকে বিশ গজ বাম দিকে।

বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের অনুরোধে এই বিশেষ হ্যাঙ্গারটা পাহারা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী থেকে পাঠানো হয়েছে গার্ডদের। যদিও কোনও ধারণা নেই হ্যাঙ্গারের ভিতরের কোন্ জিনিসটাকে পাহারা দিচ্ছে তারা। শুধু জানে, সিকিউরিটি কোড ছাড়া কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না; আর কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া একটা স্ক্রু পর্যন্ত হ্যাঙ্গার থেকে বের করা যাবে না।

কালো কাপড়ের সুট পরা থাই পাঁচজন ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখে বিনকিউলার তুলল টিম লিডার তাইম আনন্দ। আঙুলগুলো স্থির রাখতে পারে না সে, বিনকিউলারের গায়ে তবলা বাজাচ্ছে। হ্যাঙ্গারের বেশ খানিকটা ভিতরে লালচিনের তৈরি দুটো জেট প্লেন 'ঈগল' দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এগুলো লালচিনের কাছ থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছে

বাংলাদেশ। দুটো ঈগলের সঙ্গে তিনজন করে ছয়জন ক্রুও এসেছে ঢাকায়, বাংলাদেশী পাইলটদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।

ডক্টর নাদিরার অনুরোধে ঈগল দুটোর কাছে সব সময় ওই ক্রুদের একটা গ্রুপকে প্রস্তুত রাখা হয়, কোনও কাজ থাকুক বা না থাকুক।

বাকি তিনজনের থাকার কথা কাছের একটা থ্রি-স্টার হোটেলে। টিম লিডার খবর নিয়েছে; তিনজনই আছে নিজ নিজ কামরায়।

থাই থান্ডারের সদস্যরা জানে ওগুলোর মধ্যে একটা ঈগলকে ডেভেলপ করেছেন বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা। ওটার নাম দেওয়া হয়েছে দুরন্ত। ওটাই তাদের টার্গেট, থাকার কথা A সেকশনে।

বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের লোগো আঁকা ঈগল দুটোর ডানে-বাঁয়ে ছোটবড় আরও তিনটে প্লেন দেখা যাচ্ছে। তবে ক্রু তিনজনের কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তারা হয়তো কোনও ঈগলের ভিতর কলকব্জা পরীক্ষা করছে, কিংবা হ্যাঙ্গারের অন্যপ্রান্তে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে তাইম আনন্দ নির্দেশ দিল, 'তৈরি হও।'

যে-যার অস্ত্র চেক করে নিচ্ছে বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া থাই থান্ডার সদস্যরা।

'অ্যাকশন শুরু হবে এখন থেকে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর,' হাতঘড়ি দেখে সবাইকে জানাল আনন্দ। 'ভেতরে ঢুকে নির্বিঘ্নে কাজ সারার জন্যে বাইরের সব কজন গার্ডকে অচল করে দিতে হবে। খেয়াল রাখবে, ওদের কেউ যাতে চিৎকার দিতে না পারে। কোনও প্রশ্ন?'

এ-ধরনের অ্যাকশনে অভিজ্ঞ সবাই, কারও কোনও প্রশ্ন নেই।

‘আমরা হ্যাঙ্গারের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পজিশন নেব,’ বলল সহকারী টিম লিডার হো টাকসিন। ‘তা হলে টহলের ছকটা ধরতে পারব, দেখতে পাব হ্যাঙ্গারের ভেতরে কে কী করছে না করছে।’

নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে হ্যাঙ্গারের ত্রিশ গজের মধ্যে চলে এল ওরা। লিডারের নির্দেশে শুয়ে পড়ল সবাই, আরও পাঁচ গজ এগোল ক্রল করে।

‘সিকিউরিটি বেশ কড়া,’ চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে বলল টিম লিডার। ‘তবে... সম্ভব।’

প্রথম তাঁবুর ভিতর শুধু একজন মেজর। দ্বিতীয় তাঁবুটা কাছেই, ভিতরে মোট তিনজন সেপাই ও একজন হাবিলদার। বিশ্রামে আছে ওরা।

‘দেখতেই পাচ্ছ,’ ফিসফিস করল লিডার, ‘তিনজনের দুটো গ্রুপ হ্যাঙ্গারটাকে ঘিরে টহল দিচ্ছে, দুইজন গেটের দু-পাশে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিচ্ছে। আমাদের কাবু করতে হবে মেজরসহ মোট তেরোজনকে।’

‘আমরা কি জানি পালাবদল কটার সময়?’ দলের সদস্য ফিবুন সংগত প্রশ্ন করল।

‘জানলে খুব ভাল হত,’ বলল সহকারী টিম লিডার হো টাকসিন, হাতঘড়ির উপর চোখ। ‘পঁয়ত্রিশ মিনিট পর অ্যাকশন শুরু, তাই তো? ঠিক আছে, বস।’

দুই

অ্যামবুলেন্স থেকে নেমে বাকি দুশো গজ হেঁটে এল চুয়ানের নেতৃত্বে থাই থান্ডারের মেডিকেল গ্রুপ। সঙ্গে চাবি আছে, দরজা খুলে মাইক্রোবাসে চড়ল তারা। আলো জ্বেলে ভিতরটা একবার দেখে নিল, তারপর অন্ধকারে কাপড় পাল্টাল। প্রত্যেকে কালো সুট পরল, নিজেদের ড্রেস খুলে ভরে রাখল ব্রিফকেসে। যে যার অস্ত্র কিছু সঙ্গে রাখল, কিছু রাখল ব্রিফকেসের ভিতর।

ড্যাশ বোর্ড থেকে পাওয়া রোড ম্যাপে চোখ রেখে গাড়ি চালাচ্ছে চুয়ান। নাহার ভিলার সামনে দিয়ে যাচ্ছে তারা। লোহার গ্রিল লাগানো গেটের সামনে দুজন লোককে পাহারায় দেখতে পেল। অলস পায়ে পায়চারি করছে এক সিপাই, কাঁধে রাইফেল। লাইটপোস্টে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন হাবিলদার – এক পায়ে ভর দিয়ে, অপর পা অনবরত নাচাচ্ছে সে, হিপ হোলস্টারে পিস্তল। ক্যাপটেন বা তার আর্মারড কারটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সেনাবাহিনীর এই সদস্যরা পাহারা দিচ্ছে ডক্টর নাদিরাকে। তবে তিনি আসলে কে, কেন তাঁকে পাহারা দিতে হবে ইত্যাদি কিছুই তাদের জানা নেই।

নাহার ভিলাকে পিছনে ফেলে কিছুটা এগোবার পর ডানদিকে

বাঁক ঘুরল নীল মাইক্রোবাস, এই সময় ওদেরকে পাশ কাটাল একটা আর্মারড কার, ড্রাইভারের পাশের সিটে সতর্ক ভঙ্গিতে বসে রয়েছে তরুণ ক্যাপটেন – তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল ওদের নীল গাড়িটাকে।

ত্রিশ গজ এগোবার পর ডান পাশে পড়ল সরু প্যাসেজ, নাহার ভিলা ও থাই দূতাবাসের পিছন দিয়ে চলে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে শুধু দেখে রাখল থাই থান্ডারের সদস্যরা। ডানদিকে আরেকটা বাঁক ঘুরে থাই দূতাবাসের সামনে চলে এল তারা।

দূতাবাসের গেট খোলা। গেটের বাইরে তিনজন বাংলাদেশী পুলিশ একটা বেঞ্চে বসে আছে, হাতে রাইফেল। গেটের ভিতর দুজন থাই গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাঁধ থেকে ঝুলছে কারবাইন, হিপ হোলস্টারে গোঁজা পিস্তল। এই থাই গার্ডদের সঙ্গে সিভিল ড্রেস পরা একজন থাই অ্যাটেনড্যান্ট গার্ড রুমের ভিতর একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। হাতে কাগজ-পত্র নিয়ে বেশ কিছু লোক প্রায় ছেঁকে ধরেছে তাকে। গেটের বাইরে বেশ অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

নীল মাইক্রোবাসটা গেটের ঠিক সামনে থেমেছে। একজন থাই গার্ড এগিয়ে এল। তার হাতে একগাদা কাগজ ধরিয়ে দিল চক্রি চুয়ান । সবই নকল, তবে ধরবার উপায় নেই। ওগুলো পড়লে বোঝা যাবে তারা পাঁচজন থাই ব্যবসায়ী, দর ও দেনা-পাওনা নিয়ে বাংলাদেশী একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের বিরোধ চলছে, দূতাবাসের কমার্স সেক্রেটারির পরামর্শ ও সমাধান পাওয়ার আশায় এসেছে তারা। তারা যে আসবে, সেটা ভদ্রলোককে আগেই জানানো হয়েছে।

বিশ মিনিট পর গার্ডের কাছ থেকে নিয়ে কাগজগুলোর উপর চোখ বুলাল সিভিল ড্রেস পরা থাই অ্যাটেনড্যান্ট। ব্যাপারটা তার জানা আছে। চেয়ার ছেড়ে মাইক্রোবাসের পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'হ্যাঁ, আপনাদের আসার কথা,' চুয়ানকে বলল সে। 'কিন্তু

কমার্স সেক্রেটারি তো চলে গেছেন। আপনারা দয়া করে কাল সকালে আসুন।'

মাথা নেড়ে হাসল চুয়ান। 'কমার্স সেক্রেটারির সঙ্গে ফোনে যা কথা হবার হয়ে গেছে আমাদের। এখন সরাসরি অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু তিনিও তো নেই, মিসেসকে নিয়ে ডিনার খেতে বেরিয়েছেন,' বলল অ্যাটেনড্যান্ট।

চুয়ানের মুখে হাসিটা আরও সরল ও বিনীত হয়ে উঠল। 'আমরা অপেক্ষা করব। তবে এই গাড়িতে বসে নয়।'

শ্রাগ করল অ্যাটেনড্যান্ট। একজন গার্ডকে ডেকে বলল, 'ওঁদেরকে ওয়েটিং রুমে পৌঁছে দাও।'

গার্ডের পিছু নিয়ে বাগানের ভিতর দিয়ে এগোল থাই থান্ডারের গ্রুপটা। দেশি-বিদেশি বেশ কিছু লোককে পাশ কাটাল তারা, ভাবল নিশ্চয়ই অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওয়েটিং রুমেও কয়েকজন লোককে বসে থাকতে দেখা গেল। গার্ড ওদেরকে বসতে বলে ফিরে গেল গেটে।

একটু পর এক এক করে ওয়েটিং রুম থেকে বাগানে বেরিয়ে এল থাই থান্ডারের সদস্যরা। বাগানে লোকজন থাকলেও, বিশেষভাবে কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে না। অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দালানটার পিছনদিকে চলে এল ওরা।

এদিকে প্রচুর গাছপালা, দুই দালানের পিছনদিকটাকে জঙ্গলের মত লাগছে দেখতে। দিনের বেলা পাঁচিল রঙ করবার কাজ হয়েছে, মই সহ বেশ কিছু সরঞ্জাম পড়ে থাকতে দেখল চুয়ান। তার ইঙ্গিত পেয়ে মইটাকে খাড়া করে পাঁচিলে উঠল সঙ্গীরা, তারপর সেটাকে সেতু বানিয়ে প্যাসেজ পেরুল, নাহার ভিলাতে নামলও ওটার সাহায্যে – তারপর শুইয়ে রাখল দেয়ালের গা ঘেঁষে।

নীচে নেমেই ব্রিফকেস খুলে মুখে গ্যাস-মাস্ক পরল ওরা।

গাছপালা ও ঘেরা বাগান পার হয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। আধবুড়ি এক চাকরানি দরজার দিকে পিছন ফিরে চৌকিতে বসে চুন লাগাচ্ছে পানে। তার মুখে হাতচাপা দিল চুয়ান, অপর হাতে ধরা হাইপডারমিক সিরিঞ্জের সুইটা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল বাহুতে। তিন সেকেন্ড ধস্তাধস্তি করল মহিলা, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল চৌকির উপর। দু'ঘণ্টার আগে তার হুঁশ ফিরবে না।

দুই থাই থান্ডার গুণ্ডা ধরাধরি করে মেঝেতে নামাল অজ্ঞান মহিলাকে, পা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল চৌকির নীচে।

এরপর কিচেন। প্রৌঢ় বাবুর্চি ও তরুণী কাজের বুয়া রান্নার কাজে ব্যস্ত। পাঁচ বিদেশি ভিতরে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর, গলা টিপে ধরায় কেউ কোনও শব্দ করতে পারছে না। হাত-পা ছুঁড়ল ঠিকই, তবে ওই মাত্র তিন সেকেন্ডের জন্য, যতক্ষণ না ইঞ্জেকশন কাজ শুরু করল। এদেরও দু-ঘণ্টার আগে জ্ঞান ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। অসাড় দেহ দুটি একপাশে সরিয়ে রাখল ওরা, যেন বাইরে থেকে চট্ করে চোখে না পড়ে।

এরপর কিচেন হয়ে করিডরে বেরুল, গেস্ট রুম ও বেডরুমকে পাশ কাটিয়ে চলেছে লিভিং রুমের দিকে। একজন সহকারীকে নিয়ে সবার সামনে রয়েছে চক্রি চুয়ান। চুয়ানের এক হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল, অপর হাতে গ্যাস বোমা। সহকারীর হাতে লম্বা চকচকে ছোরা। তুলো দিয়ে জড়ানো ক্লোরোফর্ম ভর্তি টিউবটা কোটের সাইড পকেটে রেখেছে সে, প্রয়োজনের সময় ঝট করে যাতে বের করতে পারে।

গেস্ট রুম ও বেডরুমের দরজা খোলা। পাশ কাটাবার সময় চুয়ান ও তার সহকারী ধানাই ঠাকুর দেখল গেস্ট রুম খালি। তারপর আধ সেকেন্ড সময়ও পাওয়া গেল না।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে ওদের একেবারে সামনে পড়ে গেলেন প্রফেসর ডক্টর শামসুন্নাহার, হাতে একটা অ্যালবাম। কালো সুট ও গ্যাস মাস্ক পরা এতগুলো সশস্ত্র মানুষকে হঠাৎ

সামনে দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি, হাত থেকে পড়ে গেল অ্যালবামটা, নিজের অজান্তেই চিৎকার করতে যাচ্ছেন।

চুয়ান রিয়্যাক্ট করবার সময়ই পেল না। ছোরার এক কোপে ভদ্রমহিলার কণ্ঠনালী বিচ্ছিন্ন করে দিল তার সহকারী ধানাই ঠাকুর। মেঝেতে ঢলে পড়লেন তিনি, তাঁর সঙ্গে নিচু হয়ে পাশেই হাঁটু গাড়ল খুনি, উথলে বেরিয়ে আসা রক্তের ভিতর ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে ছোরার ফলাটা চালাচ্ছে এখনও। মুণ্ডুটা শরীর থেকে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত থামল না সে।

অ্যালবামটা খুলে গেছে, শিশু শামসুন্নাহার ও নাদিরার সাদা ফ্রক রাঙা হয়ে উঠল তাজা রক্তে।

ডক্টর শামসুন্নাহারের পতন ও করিডরের মেঝেতে জুতোর ঘষা লাগায় বাড়ির নীরবতা ভেঙে গেছে। লিভিং রুম থেকে ডক্টর নাদিরার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আপা? আপা, তুমি কি পড়ে গেলে নাকি?' কামরা থেকে বেরিয়ে আসছেন তিনি।

গল্প করতে করতে দুই প্রৌঢ়া নিজেদের শৈশবে ফিরে গেছেন। এক সময় শামসুন্নাহার বললেন, 'তুই বোস, পুরানো একটা ছবির অ্যালবাম নিয়ে আসি – আমার তখন দশ বছর বয়েস, তোর নয় মাস; তোকে আমি কোলে নিয়ে বসে আছি।'

হেসে উঠলেন নাদিরা। 'এত পুরানো ছবি কোথায় পেলে, আপা?'

'বলছি,' বলে লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন শামসুন্নাহার। পাঁচ মিনিটও হয়নি, করিডর থেকে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। বোনকে ডাকলেন তিনি। কিন্তু কোনও সাড়া পেলেন না।

উদ্বিগ্ন হয়ে সোফা ছাড়লেন ডক্টর নাদিরা, দ্রুত লিভিং রুম থেকে করিডরে বেরুচ্ছেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর ও পায়ের আওয়াজ শুনে এরইমধ্যে তৈরি হয়ে

গেছে চক্রি চুয়ানের সহকারী ধানাই ঠাকুর। একহারা কাঠামো তার, চোখে চশমা, চেহারায় আঁতেল ভাব। ছোরার ফলা থেকে টপ টপ করে রক্তের ফোঁটা ঝরছে। চট্ করে সেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে লাফ দিয়ে লাশ ডিঙিয়ে চৌকাঠের পাশে দেয়াল ঘেঁষে সিধে হয়ে দাঁড়াল। কোটের সাইড পকেট থেকে ক্লোরোফর্মের টিউবটা বের করে ফেলেছে সে ইতিমধ্যেই।

টিউবের মাথায় ছোট্ট একটা বোতাম, সেটায় আঙুল রেখেছে ধানাই ঠাকুর। ঠিক এই সময় চোখে চশমাটা পরতে পরতে চৌকাঠ পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলেন ডক্টর নাদিরা। হাতের টিউবটা তাঁর মুখের দিকে তাক করে বোতামে চাপ দিল সে। কী ঘটছে বুঝতে না পারলেও, লোকগুলোর মুখে মাস্ক দেখে দম আটকাবার চেষ্টা করলেন ডক্টর নাদিরা, কিন্তু তার আগেই ফুসফুসে পৌঁছে গেছে ক্লোরোফর্ম। দুই কি তিন সেকেন্ড পর, তার বেশি নয়, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা জ্ঞান হারালেন।

তাঁকে একটা চেয়ারে বসানো হলো। বন্ধ চোখ দুটো টেপ দিয়ে খোলা রাখার ব্যবস্থা করল ধানাই ঠাকুর। টেপের টুকরোগুলো ডক্টর নাদিরার গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে আছে। পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে দ্রুত তাঁর একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো তুলল চক্রি চুয়ান। এই ফটো এখনই একটা জাল পাসপোর্টে সাঁটা হবে।

এরপর ধানাই ঠাকুরকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল আরও দুজন। নামাজের ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে ঊরুর উপর ব্রিফকেস রাখল একজন, দ্রুত হাতে সেটা খুলে বের করল অক্সিজেন মাস্ক, স্যালাইন ভর্তি ব্যাগসহ অন্যান্য সরঞ্জাম। আরেকজনের ব্রিফকেস থেকে বেরুল মিনি অক্সিজেন বটল। ডক্টর নাদিরাকে রোগিণী বানাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা, শুধু একজন বাদে।

কোটের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে গালকাটা রুস্তমের মোবাইল নম্বরে ডায়াল করছে চক্রি চুয়ান ।

তিন

নাহার ভিলার গেটের বাইরে, আর্মারড কারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন জাহিদ । চোখে উজ্জ্বল আলো পড়তেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে । একটা গাড়ি বাঁক ঘুরছে এদিকে – তারই হেডলাইটের আলো ।

গাড়ির ছাদে লাল-নীল ও সাদা আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে নাহার ভিলার দিকে অ্যামবুলেন্স চালাচ্ছে গালকাটা রুস্তম । গতি বেশি নয়, খানিক এগিয়ে হেডলাইটের আলো ডিপ করল, গার্ডরা যাতে নার্ভাস হয়ে না পড়ে ।

অ্যামবুলেন্সের মন্থর গতি, ড্রাইভারের সতর্ক আচরণ সন্দিগ্ধ করে তুলল ক্যাপটেন জাহিদকে । 'সাবধান,' হাবিলদার কামরান ও সিপাই জব্বারের উদ্দেশে বিড়বিড় করল সে । আর্মারড কারের ড্রাইভিং সিটে বসা ড্রাইভারও নির্দেশ শুনে সতর্ক হয়ে উঠল ।

ঠোঁটের নড়াচড়া দেখেই অ্যামবুলেন্সের ড্রাইভিং সিটে বসা গালকাটা রুস্তম বুঝে নিল কী বলল ক্যাপটেন ।

নাহার ভিলার গেটের কাছাকাছি, আর্মারড কারের পিছনে অ্যামবুলেন্স থামাল সে, জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাড়ির নেমপ্লেট পড়বার ভান করল, তারপর বলল, 'গাড়িটা দয়া করে সরাবেন, সার? আমাকে নাহার ভিলায় ঢুকতে হবে ।'

দুই কোমরে হাত রেখে অ্যামবুলেন্সের পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাপটেন জাহিদ, ডান হাতের আঙুলগুলো হিপ হোলস্টারে গুঁজে রাখা পিস্তলের বাঁট ছুঁয়ে আছে। 'কী বললেন? আবার বলুন।'

বিনয়ের সঙ্গে হাসল গালকাটা রুস্তম। 'নাহার ভিলা থেকে আমাদের অফিসে ফোন করা হয়েছে, সার। সিরিয়াস কেস, পেশেন্টকে ইমিডিয়েটলি ধানমণ্ডি ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

ভ্রূ কোঁচকাল ক্যাপটেন। 'স্ট্রেঞ্জ! বাড়ির ভেতর কে কখন অসুস্থ হলেন যে অ্যামবুলেন্স ডাকতে হবে?' ঘাড় ফিরিয়ে হাবিলদার ও সিপাইয়ের দিকে তাকাল সে। 'তোমরা কিছু জানো?'

'অসুস্থ? না!' হাবিলদারকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাল। সিপাই হতভম্ব।

অ্যামবুলেন্স ড্রাইভারের দিকে ফিরল ক্যাপটেন। 'কোথাও ভুল করেছেন। আমরা অনেকক্ষণ হলো নাহার ভিলা পাহারা দিচ্ছি। বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে প্রথমে আমাদেরকেই জানানোর কথা।'

'এই দেখুন, অফিস থেকে এই কাগজটা দিয়েছে আমাকে,' বলল গালকাটা রুস্তম, শার্টের বুক পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরল সে।

সেটা নিয়ে পড়ল ক্যাপটেন – 'হার্ট-অ্যাটাকের কেস। রোগিণীর জ্ঞান নেই। যত তাড়াতাড়ি পারো হসপিটালে পৌঁছে দিতে হবে।' নীচে নাহার ভিলার ঠিকানা।

'তাই তো।' চিন্তিত হয়ে উঠল ক্যাপটেন জাহিদ। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখছি,' বলে ঘুরল সে, তারপর ইঙ্গিতে হাবিলদারকে সাবধান করে বাড়ির ভিতর ঢুকল, তার পিছু নিল রাইফেলধারী সিপাই ও আর্মারড কারের ড্রাইভার।

ভিতরে ছোট্ট একটা গাড়িপথ, তবে বাঁক নিয়ে চোখের

আড়ালে চলে গেছে, দু'পাশে কেয়ারি করা বাগান। তারপর কয়েকটা ধাপের উপর সদর দরজা।

দরজায় নক করল ক্যাপটেন জাহিদ। সঙ্গে সঙ্গে কপাট খুলে গেল। চোখের পলকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল সশস্ত্র থাই থান্ডারের খুনিরা।

বয়স কম, বিপদ টের পেয়ে ক্যাপটেন জাহিদের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার হাত ও পা ঝাপসা দেখাল, দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা গেল না। কোত্থেকে আঘাতটা এল টেরই পায়নি, লাথি ও ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল থাই থান্ডারের দুজন সদস্য। পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেছে ক্যাপটেনের, আর এক সেকেন্ড সময় পেলে বিদেশী শত্রুদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে সে।

কিন্তু তার আগেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ট্রিগার টেনে দিল চক্রি চুয়ান। সাইলেন্সার থাকায় ঢব করে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো শুধু, গেট থেকে কারও শুনতে পাওয়ার কথা নয়। লাশটা পাকা মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলা হলো।

একই সঙ্গে মারা গেল আর্মারড কারের ড্রাইভারও। গলায় ছুরি চালিয়ে তাকে জবাই করেছে ধানাই ঠাকুর।

ঠিক দুই মিনিট পর হাবিলদার শুনতে পেল তার নাম ধরে ডাকছে সিপাই। 'হাবিলদার সাব, অ্যামবুলেন্স আসতে দিন। আপনিও চলে আসেন, এখানে কাজ আছে,' বাড়ির সদর দরজা থেকে কথা বলছে সিপাই, তার শিরদাঁড়ায় পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে রেখেছে ধানাই ঠাকুর।

সিপাই জব্বারের ডাক শুনে এক কি দু'সেকেন্ড ইতস্তত করল হাবিলদার কামরান। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে গালকাটা রুস্তমকে ইঙ্গিত করল গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকার, নিজেও গাড়ি পথ ধরে এগোচ্ছে দ্রুত পায়ে।

বাঁকের কাছে, গাছপালার আড়ালে, ছুরি হাতে তাকে জবাই করবার জন্যে অপেক্ষা করছে চক্রি চুয়ান। লম্বা-চওড়া হাবিলদার

ঠিক যখন পাশ কাটাচ্ছে তাকে, ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে চোখের পলকে নাগালের বাইরে চলে গেল টার্গেট।

ঝোপের পাতা নড়ে ওঠা মাত্র স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে গিয়ে কারাতের আক্রমণাত্মক একটা ভঙ্গি নিল হাবিলদার কামরান, পরমুহূর্তে ফ্লাইং কিক মেরে গুঁড়িয়ে দিল চক্রি চুয়ানের ছোরা ধরা বাম হাতের কবজি। ওটায় জড়ানো ছিল প্ল্যাটিনামের তৈরি একটা ব্রেসলেট, হুক খুলে যাওয়ায় ছিটকে অন্ধকার ঝোপের ভিতর গিয়ে পড়ল সেটা।

শেষ রক্ষা হলো না, আচমকা ছুটে এসে অ্যামবুলেন্সটা চাপা দিল হাবিলদারকে। গাড়ির ধাক্কায় প্রথমে ছিটকে পড়ল সে। পরমুহূর্তে একটা চাকা তার মাথার উপর উঠে পড়ল। খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়ায় মৃত্যু হলো প্রায় তৎক্ষণাৎ।

এরপর সিপাই জব্বারের মাথার পিছনে একটা গুলি করল ধানাই ঠাকুর, লাশটা ধরে ফেলল মেঝেতে পড়ার আগেই, শুইয়ে দিল দরজার গোড়ায়।

ইতিমধ্যে অ্যামবুলেন্স ঘুরিয়ে নিয়েছে গালকাটা রুস্তম। সেটা থেকে স্ট্রেচারটা বের করে নিয়ে আবার বাড়ির ভিতর ঢুকল থাই থান্ডারের খুনিরা। এক মিনিট পরেই বেরিয়ে এল তারা, স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছেন অচেতন ডক্টর নাদিরা, মুখে অক্সিজেন মাস্ক, হাতের শিরায় ঢোকানো স্যালাইন পুশ করবার সুই।

ইতিমধ্যে থাই থান্ডারের পাঁচ মাফিয়া সদস্য যে যার ব্রিফকেস থেকে বের করে ডাক্তার, মেইল নার্স ও আরদালির ড্রেস পরে নিয়েছে আবার। 'ইয়েস, কাটা রুস্তম, ইয়েস!' বলল চক্রি চুয়ান, ভাঙা কবজির ব্যথা সহ্য করবার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে। 'গাড়ি ছাড়ুন!'

অ্যামবুলেন্স নিয়ে নাহার ভিলা থেকে বেরিয়ে এল গালকাটা রুস্তম। কিছু দূর আসবার পর সাইরেন অন করল সে, ফুলস্পিড

তুলে ছুটছে এয়ারপোর্টের দিকে।

জিয়া বিমানবন্দর।

থাই থান্ডারের প্রথম গ্রুপ ঘড়ির কাঁটা ধরে রাত ঠিক আটটা পনেরো মিনিটে অ্যাকশনে গেল। তার আগে সবাই গ্যাস মাস্ক পরে নিয়েছে।

হ্যাঙ্গারটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে তিন সিপাইয়ের দুটো গ্রুপ। প্রতিবার চক্কর দিতে সময় লাগছে দশ মিনিট। এক গ্রুপ ঘুরে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছে দ্বিতীয় গ্রুপ। এই মাত্র বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল টহলদার প্রথম গ্রুপ। ঠিক পাঁচ মিনিট পর এখান দিয়ে যাবে দ্বিতীয় গ্রুপ।

হ্যাঙ্গারের গেটে পাহারা দিচ্ছে দুই সিপাই। ধরা-বাঁধা কোনও নিয়ম নেই, যখন খুশি নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে জিপ নিয়ে নিজেও এক চক্কর ঘুরে আসছেন মেজর খোদা বক্স। বাকি সিপাইরা তাঁবুর ভিতরে শুয়ে-বসে আছে। তাদের সঙ্গেই রয়েছে হাবিলদার।

আটটা আঠারো মিনিটেও এরকম একবার বেরুলেন মেজর খোদা বক্স। কোণ ঘুরে তাঁর জিপ হ্যাঙ্গারের আড়ালে চলে গেছে, এই সময় টিম লিডার তাইম আনন্দের নির্দেশে থান্ডার খুনিদের একজন একটা গ্যাস বোমা ছুঁড়ল হ্যাঙ্গারের বিশ গজ বাম দিকে, দ্বিতীয় তাঁবু লক্ষ্য করে।

তাঁবুর ভিতর এই মুহূর্তে হাবিলদার সহ তিন সিপাই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করছে, পটকা ফাটার মত আওয়াজ শুনে পলকের জন্য স্থির হয়ে গেল তারা। পরমুহূর্তে যে-যার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। তবে কারও আঙুলই অস্ত্রের নাগাল পেল না, অদৃশ্য গ্যাস ফুসফুসে ঢোকা মাত্র জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল তারা।

বিশ গজ দূর থেকে দ্বিতীয় তাঁবুর সিপাইদেরকে কাত হয়ে

পড়ে যেতে দেখল তাদের দুই সঙ্গী, যারা হ্যাঙ্গারের মুখে পাহারা দিচ্ছে। কিছু না ভেবেই সাহায্যের জন্য ছুটল তারা। ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে গ্যাস – মাত্র পাঁচ কি সাত গজ এগোতে পারল ওরা, তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগে ফুসফুসে বিষ নিয়ে জ্ঞান হারাল।

আরও দুই মিনিট পর প্রথম টহল পার্টি ও মেজরকে প্রায় একই সঙ্গে ফিরে আসতে দেখল থান্ডাররা। জিপটা শম্বুকগতিতে চালাচ্ছেন মেজর, তিন সিপাই জিপের পিছু নিয়ে হেঁটে আসছে। হ্যাঙ্গারের মুখ থেকে ত্রিশ গজ দূরে এখনও, এই সময় পরপর দুটো নার্ভ গ্যাস ছুঁড়ল ফিবুন সংগত। একটা জিপ লক্ষ্য করে, অপরটা জিপের গজ দশেক পিছনের টহল পার্টিকে লক্ষ্য করে।

সম্ভবত ষষ্ঠইন্দ্রিয় সতর্ক করে দেওয়ায় নিজের অজান্তেই সাবধান ছিলেন মেজর। গ্যাস বোমাটা অর্ধেক পথও পেরোয়নি, তাঁকে লক্ষ্য করে কিছু একটা ছোঁড়া হয়েছে বুঝতে পেরে জিপের ড্রাইভিং সিট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন তিনি, হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তলটা।

টারম্যাক ধরে আগের মতই মন্থর গতিতে এগোচ্ছে জিপ। টিম লিডারের ইঙ্গিত পেয়ে থাই ড্রাগনের একজন ছুটল ওটার দিকে। লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠল সে। হ্যাঙ্গারের হাঁ করা প্রকাণ্ড মুখটাকে পাশ কাটিয়ে তাঁবু দুটোর দিকে যাচ্ছে জিপ।

টারম্যাকে নেমে পড়ার আগেই মেজরের কানে এসেছে মৃদু একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। দুটো গড়ান দিয়ে এক ঝটকায় সিধে হলেন। চমকে উঠে দেখলেন তাঁর পাঁচ হাত সামনে হাতির শুঁড়ের মত দেখতে গ্যাস মাস্ক পরা এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতের সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা তাঁর দিকে তাক করা। দম আটকে রেখে চট্ করে হাঁটু গাড়লেন টারম্যাকে, ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে তাঁর সার্ভিস রিভলভার।

'দুপ!'

সোজা এসে হৃৎপিণ্ডে ঢুকল তপ্ত সীসা। চমকে উঠলেন মেজর, মাথাটা নিচু হয়ে গেল, দেখলেন টারম্যাকটা উঠে আসছে তাঁর দিকে। ঠাস করে শব্দ হলো কপালটা ঠুকে যাওয়ায়, পরমুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল জগৎটা। কাত হয়ে ঢলে পড়ে গেলেন টারম্যাকে।

জিপের দশ গজ পিছনে থাকা তিন সিপাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই গ্যাসের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

টহলে রয়েছে আর তিনজন সিপাই।

সহকারী টিম লিডার হো টাকসিন হ্যাঙ্গারের মুখ থেকে কিছুটা এগিয়ে গেল, সঙ্গে ফিবুন সংগত। তিনজোড়া বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসছে শুনে হ্যাঙ্গারের গা ঘেঁষে টারম্যাকের উপর শুয়ে পড়ল দুজনেই।

একটু পরেই হ্যাঙ্গারের কোণ ঘুরে প্রহরীদের গ্রুপটাকে এগিয়ে আসতে দেখল হো টাকসিন। নিচু গলায় ফিবুন সংগতের কাছ থেকে একটা গ্যাস বোমা চেয়ে নিল সে। বিশ গজের মধ্যে চলে আসতে সিপাইদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ল সেটা।

চোখের কোণ দিয়ে এক সিপাই দেখল, টারম্যাকের মেঝে থেকে কারও হাত কিছু একটা ছুঁড়েছে। 'সাবধান!' অভ্যাসবশত হুঁশিয়ার করল সে, দৌড় দিল সামনের দিকে। পটকা ফাটার মত মৃদু একটা শব্দ ঢুকল কানে। পরমুহূর্তে টারম্যাকের পাকা মেঝেতে আছড়ে পড়ল তার অচেতন শরীর।

কী হচ্ছে কারও কোনও ধারণা নেই, অপর দুজন সিপাই ছুটে পালাবার চেষ্টা করল। যেদিকে ছুটল সেদিকে অদৃশ্য নার্ভ গ্যাস এখনও ছড়ায়নি, স্লো মোশনে তিন কি চার পা এগোতে পারল মাত্র। তাদের জন্য দুজন থাই তৈরি হয়ে আছে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল নিয়ে। ঢব ঢব ভোঁতা আওয়াজ হলো দুটো। সব শেষ।

যারা মারা গেছে ও যাদের জ্ঞান নেই, কোনও রকম

বাছবিচার না করে সবাইকে পণ্য ভর্তি বস্তার মত গাদাগাদি করে তোলা হলো ছাদ-খোলা জিপে – জ্যান্ত মানুষের উপর লাশের স্তূপ তৈরি হলো। সেই স্তূপে সওয়ার হলো চার থাই থান্ডার সদস্য। বাকি একজন, টিম লিডার তাইম আনন্দ, ড্রাইভিং সিটে বসেছে। জিপ ছেড়ে দিল সে। ঢুকে পড়ল হ্যাঙ্গারের ভিতর।

এখনও ক্রুদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জিপ থামিয়ে হাঁটুর উপর হ্যাঙ্গারের একটা নকশার ভাঁজ খুলল টিম লিডার তাইম আনন্দ, সেটার সঙ্গে হ্যাঙ্গারের ভিতরের দৃশ্যের হুবহু মিল দেখতে পাচ্ছে সে। ঈগল দুটোকে একই সরলরেখার উপর রাখা হয়েছে, মাঝখানে বিশ গজের মত ব্যবধান।

ডেভেলপ করা ঈগল রয়েছে A সেকশনে, অর্থাৎ সামনের দিকে, দরজার দিকে মুখ করে। অপর ঈগল রয়েছে B সেকশনে, প্রথমটার পিছনে।

জিপের ইঞ্জিন খুব কম আওয়াজ করছে, ফলে বেইজিং থেকে আসা ক্রুরা একেবারে শেষ মুহূর্তে টের পেল, যখন আর কিছুই করবার নেই। A সেকশনে রয়েছে তারা, ডেভেলপ করা ঈগলের পিছন দিকে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সামনে চলে আসছে তিনজনই, ভাবছে মেজর খোদা বক্স নিশ্চয়ই কোনও জরুরি বিষয়ে আলাপ করতে চান।

আরেকটু এগোতেই কয়েকটা সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলের মুখে পড়ে গেল তারা। হো টাকসিন কোনও আওয়াজ করতে নিষেধ করল তাদেরকে। জিপ থেকে নেমে পঞ্চাশ গজ হেঁটে হ্যাঙ্গারের দরজার কাছাকাছি ফিরে গেল টিম লিডার তাইম আনন্দ। স্মোক স্ক্রিন তৈরি করবার জন্য একটা বোমা ফাটাল সে। মুহূর্তে ঘন ধোঁয়া আড়াল করল এপাশের সমস্ত কার্যকলাপ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানবন্দরের আরেক প্রান্ত দিয়ে টারম্যাকে ঢুকল সেই অ্যামবুলেন্সটা, চালিয়ে আনছে গালকাটা রুস্তম। অজ্ঞান ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে গাড়ির ভিতর রয়েছে

ডাক্তার, নার্স ও আরদালির ড্রেস পরা থাই থান্ডারের দ্বিতীয় গ্রুপটা। চিফ চক্রি চুয়ানের নির্দেশে ফ্লাইং অ্যামবুলেন্সের দিকে ছুটছে ওটা।

ওদিকে গাঢ় ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে স্পেশাল হ্যাঙ্গারের ভিতরটা। একের পর এক অনেকগুলো বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল টার্মিনাল-ভবন থেকে। দশ মিনিট পর বেজে উঠল কান ফাটানো ফায়ার অ্যালার্ম। ইতিমধ্যে স্মোক-স্ক্রিনের ধোঁয়া অনেক হালকা হয়ে এসেছে, তার ভিতর কমলা আগুনের লকলকে শিখা অনেক দূর থেকেও দেখতে পেল এয়ারপোর্ট ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ফায়ার অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে পানি ও ফোম নিয়ে রওনা হয়েছে তারা। তাদের পিছু নিয়ে জিপ ও কার নিয়ে ছুটে আসছে পাইলট ও গ্রাউন্ড টেকনিশিয়ানদের কয়েকটা গ্রুপ।

টার্মিনাল ভবন ও কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে লাউডস্পিকারে বার বার সংশ্লিষ্ট বিমানগুলোর পাইলট ও ক্রুদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে, আগুন ছড়িয়ে পড়বার আগেই যে যার প্লেন নিয়ে যেন আকাশে উঠে পড়ে।

এয়ারপোর্টের চারদিকে অনেকগুলো প্লেন ছিল, একের পর এক আকাশে উঠে যাচ্ছে সব, সেগুলোর মধ্যে গায়ে ক্রসচিহ্ন আঁকা এবং মাউন্ট এলিজাবেথ ফ্লাইং অ্যাম্বুলেন্স লেখা প্লেনটাও রয়েছে, কাগজ-পত্র অনুসারে রোগিণীকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে যাবে ওটা।

তবে ওই ফ্লাইং অ্যাম্বুলেন্স আকাশে ওড়ার আগে থাই ক্রুরা ওটার গা থেকে ক্রসচিহ্ন ও হাসপাতালেন নাম লেখা তুলে নিয়েছে। পুরু একটা কাগজের উপর এঁকে ও লিখে প্লেনের গায়ে সেঁটে রাখা হয়েছিল ওটা, খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলেও কিছু বোঝার উপায় ছিল না।

কাগজটা সরিয়ে ফেলতে নীচের লেখাগুলো বেরিয়ে পড়েছে:

BLUE BIRD AIRWAYS.

এয়ারপোর্টের দূর প্রান্তের স্পেশাল হ্যাঙ্গারের পিছনের গেট দিয়ে চারটে প্লেন নিরাপদেই বেরিয়ে এল, একে একে উড়ে গেল আকাশে। ওগুলোর মধ্যে একটা ঈগলও রয়েছে।

স্মোক-স্ক্রিনের ধোঁয়া সরে যাওয়ায় হ্যাঙ্গারের ভিতর এখন শুধু একটা ঈগলকে দেখতে পাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। A সেকশনে আগুনের একটা প্রকাণ্ড বল এখন ওটা, দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভিতরে এত বেশি বিস্ফোরক ছিল যে আগুন নেভার পর ছাই ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাবে না কেউ। ছাইয়ে পরিণত হচ্ছে ওটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সামরিক বাহিনীর একটা জিপও। ওটার দশ-বারোজন আরোহীও পুড়ছে, জ্যান্ত ও মরা একসঙ্গে।

ফুয়েল পুড়ে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কোনওভাবেই A সেকশনের আগুনটা নেভাতে পারল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ফোম ছিটাবার পর আগুন নিভল বটে, কিন্তু ঈগলটার কোনও কিছুই অবশিষ্ট পাওয়া গেল না, ইস্পাত পর্যন্ত গলে গেছে। একই অবস্থা আরোহী সহ মেজর খোদা বক্সের জিপটারও।

ইতিমধ্যে টার্মিনাল ভবন ও কন্ট্রোল টাওয়ারে এয়ারপোর্ট আর সেনাবাহিনীর সিকিউরিটি অফিসাররা ভিড় করেছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে হোটেল থেকে আসা চিনা ক্রুদের অপর গ্রুপটাও। আগুন নেভার খবর পেয়ে সবাই স্পেশাল হ্যাঙ্গারের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে গেল।

চিনা ক্রুরা হতভম্ব হয়ে দেখল, A সেকশনে যে ঈগলটা নিয়ে কাজ করছিলেন ডক্টর নাদিরা, সে-জায়গায় পড়ে আছে গলে যাওয়া অ্যালয় ও ইস্পাতের স্তূপ, দেখে বোঝার উপায় নেই, কিছুক্ষণ আগেও ওটা একটা প্লেন ছিল। এমনকী হ্যাঙ্গারের মেঝে পর্যন্ত পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

আগুন লাগবার প্রায় এক ঘণ্টা পর কন্ট্রোল টাওয়ারের অল

ক্লিয়ার সিগনাল পেয়ে এক এক করে কয়েকটা প্লেন ফিরে এল টারম্যাকে। চার-পাঁচটা প্লেন চট্টগ্রাম ও কোলকাতায় চলে গেছে। ফিরে আসা জেটগুলোর মধ্যে B সেকশনের সেই ঈগলটাও আছে, বাকি প্লেনগুলোর মত ওটাকেও এতক্ষণ এয়ারপোর্টকে ঘিরে বিরাট বৃত্ত রচনা করে চক্কর দিতে দেখেছেন এয়ারপোর্ট ও সেনাবাহিনীর সিকিউরিটি অফিসাররা। তাঁরা ধরে নিলেন, নিজেদের ঈগল জ্বলছে দেখে চিনা ক্রুদের প্রথম গ্রুপটাই বাঁচাবার জন্য ওটাকে আকাশে তুলেছিল।

ঈগলটা ল্যান্ড করল আগুন লাগা স্পেশাল হ্যাঙ্গারের কাছ থেকে অনেকটা দূরে।

চিনা ক্রুদের দ্বিতীয় গ্রুপ ল্যান্ড করা ঈগলের দিকে হনহন করে এগোল, প্রথম গ্রুপের সঙ্গে কথা বলে জানতে চেষ্টা করবে হ্যাঙ্গারের ভিতর ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে আগুন ধরল। কারণ, ওরাই তো প্রত্যক্ষদর্শী, আগুন লাগবার সময় হ্যাঙ্গারের ভিতর ছিল।

কিন্তু ঈগলটার কাছে এসে কাউকেই ওরা দেখতে পেল না। না বাইরে, না ভিতরে।

চারদিকে খবর পাঠানো হলো। লাউডস্পিকার থেকে বলা হলো, ঈগল নিয়ে সদ্য নেমে আসা চিনা ক্রুরা যেন কন্ট্রোল টাওয়ারে উপস্থিত সেনাবাহিনী অথবা এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসারকে রিপোর্ট করে।

আরও এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সিকিউরিটি কর্মকর্তারা অস্থির হয়ে উঠলেন। চিনা ক্রুদের প্রথম গ্রুপটার কোনও খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না – এয়ারপোর্টের কোথাও নেই ওরা, নিজেদের হোটেলেও ফিরে যায়নি।

আগুন লাগার পর দেড় ঘণ্টা পার হতে চলেছে। ডেভেলপ করার কাজ চলছিল যেটায়, সেই ঈগল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; এই খবরটা সবচেয়ে আগে যাঁকে দেওয়ার কথা, এয়ারপোর্ট

সিকিউরিটির অফিস থেকে এতক্ষণে তাঁকে ফোন করা হচ্ছে।

কিন্তু ফোনে ডক্টর নাদিরাকে পাওয়া গেল না – না তাঁর ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে, না তাঁর বোন ডক্টর শামসুন্নাহারের বনানীর বাড়িতে। রিসিভারই তুলছে না কেউ।

দু'এলাকার থানাকে খবর নিতে বলা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা হয়ে গেল সব। বনানীর নাহার ভিলায় পাওয়া গেল ডক্টর শামসুন্নাহার ও সৈনিকদের লাশ। তিন চাকর-চাকরানীর জ্ঞান ফিরল দু'আড়াই ঘণ্টা পর। কিন্তু জেরার উত্তরে কিছুই তারা বলতে পারল না।

তদন্তের শুরুতেই জানা গেল নাহার ভিলার ঠিক পিছনেই রয়েছে থাই দূতাবাস, একটা নীল মাইক্রোবাসে চড়ে দূতাবাসপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল পাঁচজন থাই ব্যবসায়ী। তাদেরকে দূতাবাসের ভিতর ওয়েটিং রুমে বসানো হয়েছিল।

পরে ওই পাঁচ থাইয়ের খোঁজ করা হয়। কিন্তু কোথাও তাদেরকে দেখা যায়নি। মাইক্রোবাসটা অবশ্য দূতাবাসের বাইরে রয়েই গেছে। তদন্তে জানা গেল, একটা নাম করা রেন্ট-আ-কার কোম্পানির গাড়ি ওটা, ভাড়া করেছিল শাহিন নামে সুদর্শন এক তরুণ। তরুণের ঠিকানায় গিয়ে জানা গেল শাহিন নামে সেখানে কেউ থাকে না।

পুলিশ, সিআইডি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স উপসংহারে পৌঁছাল, নিশ্চয়ই কুখ্যাত কোনও থাই অপরাধী চক্র ধরে নিয়ে গেছে ডক্টর নাদিরাকে। সেই সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে তাঁর সাধনার ফসল দুরন্ত ঈগলকে।

চার

দুদিন পর। থাইল্যান্ড। দোই ইনথানন।

মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন এই পাহাড়শ্রেণী মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। আজ সকাল থেকে একটানা চেষ্টা করে আড়াই হাজার ফুট ওঠার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ইমরুল কায়েস, রানা এজেন্সির ব্যাংকক শাখার প্রধান। এই মুহূর্তে একটা পাথরের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ও।

কায়েসের অনেকদিনের ইচ্ছে দোই ইনথাননের চূড়ায় উঠবে। এক হপ্তার ছুটি পাওনা ছিল, দরখাস্ত লিখে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতেই মঞ্জুর হয়ে গেল সেটা। এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে ও। সহকারী লাবণী সামাদকে অফিসের দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ব্যাংকক থেকে একাই চলে এসেছে পাঁচশো মাইল দূরে, দোই ইনথাননের কোলে। হেলিকপ্টার সার্ভিস থাকায় মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছে তার আসতে।

ওর থাই প্রেমিকা মোহনার কাছে গোটা ব্যাপারটা গোপন রেখেছে কায়েস। কারণ, বললে সে-ও ওর সঙ্গে আসবার জন্য জিদ ধরত। ওর মত তারও ভারি শখ দোই ইনথাননের চূড়ায়

উঠবে। কিন্তু বিশেষ একটা কারণে তাকে পাহাড়ে উঠতে দিতে রাজি নয় কায়েস। না, সেরকম কোনও ঝুঁকি তাকে নিতে দিতে পারে না ও।

কাল সকাল থেকে এই পাহাড়ে রয়েছে ও। কাল ও আজ মিলিয়ে পাঁচ হাজার ত্রিশ ফুট উঠতে পেরেছে।

দোই ইনথাননই থাইল্যান্ডের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, আট হাজার পাঁচশো ত্রিশ ফুট উঁচু। চূড়ায় পৌঁছাতে হলে এখনও দুই হাজার পাঁচশো ফুট উঠতে হবে। এদিকে লোকজন থাকার কথা নয়, অন্তত অনেকক্ষণ হলো কারও সাড়া-শব্দ পাচ্ছে না ও।

ঘড়িতে এখন থাই সময় দুপুর দুটো, পথ হারিয়ে না ফেললে দিনের আলো থাকতে থাকতে চূড়ায় ওঠা হয়তো সম্ভব, কিন্তু নামতে নির্ঘাত সন্ধে পার হয়ে যাবে। মনে পড়ল আজ সন্ধ্যা সাতটায় ওর ব্যাংকক স্যুইটে এসে বসে থাকবে মোহনা। তার সঙ্গে সেরকমই কথা হয়ে আছে। প্রিয়জনকে না জানিয়ে এত দূরে একা চলে আসবার অপরাধ খণ্ডন করবার জন্য তাকে অন্তত একটা ফোন তো করতে হবে, নাকি!

কায়েসের ওঠার গতি অত্যন্ত ধীর। পাঁচ-সাত ঘণ্টার দূরত্ব পার হতে তিন গুণ বেশি সময় লেগে যাচ্ছে।

দেরি হওয়ার অবশ্য একাধিক কারণ আছে। রহস্যময় কী যেন একটা ব্যাপার আছে এই পাহাড়ে। ওঠার পথে কয়েকটা পাহাড়ী বসতিতে আগুন জ্বলতে দেখেছে কায়েস, বসতির থাই বাসিন্দারা আতঙ্কে দিশেহারা, কারণ আগুন লাগার কোনও কারণই তারা ধরতে পারছে না। ওকে তারা কিছু অগ্নিদগ্ধ গাছপালা দেখিয়েছে, ওগুলো নাকি ওদের চোখের সামনে বিনা বজ্রাপাতে, বিনা কারণে হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

তা ছাড়া, পাহাড়ী এই ট্রেইল কায়েস চেনে না, ফলে প্রায়ই পথ হারিয়ে ফেলছে। দেরি হওয়ার আরেকটা কারণ, আশপাশে চিনা লোকজনের উপস্থিতি টের পেলে সরে গিয়ে অন্য পথ ধরতে

হচ্ছে ওকে। কারণ হুমকিটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর।

সরকার অনুমোদিত, অর্থাৎ রেজিস্টার্ড গাইড ছাড়া দোই ইনথাননের মূল চূড়ায় ওঠা নিষেধ। কারণটা আর কিছু নয়, থাই পর্যটন মন্ত্রণালয় চায় না ট্যুরিস্টরা পথ হারিয়ে কোনও রকম বিপদে বা দুর্ঘটনায় পড়ুক।

কাল সকালে এই নিয়ম পালন করতে গিয়েই গুণ্ডা টাইপের কয়েকজন চিনার সঙ্গে লেগে গেছে কায়েসের।

সরকারী বেস ক্যাম্পের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে গাইডরা। ওর মত আরও কিছু লোক শখ করে পাহাড়ে চড়তে এসে তাদের খোঁজ করছিল। কিন্তু একজন গাইডকেও পাওয়া যায়নি।

কাছেপিঠে পুলিশের কিছু সিপাইকে দেখা গেছে, প্রথমে তারা ট্যুরিস্টদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তারপর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুনতে না পাওয়ার ভান করে ওখান থেকে সরে গেছে। অবাক কাণ্ড!

পাহাড়ে চড়তে আসা লোকের ভিড় ধীরে ধীরে বাড়ছিল। হঠাৎ কোত্থেকে একদল চিনা এসে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল: বিশেষ কারণে স্থানীয় প্রশাসন দুই মাসের জন্য দোই ইনথানন পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ করেছে, কাজেই আপনারা চলে যান।

থাইল্যান্ডে প্রচুর চিনা বাস করে, জানা আছে কায়েসের। তাই ওদেরকে দেখে অবাক হয়নি ও। তবে অবাক হয়েছে থাই লোকজনের অভাব দেখে।

এক ভারতীয় ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, কাগজে কিছু ছাপা হয়নি, টিভির নিউজেও কিছু বলেনি, তা হলে কী করে বুঝব নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

কায়েস জানতে চেয়েছে, বিশেষ কারণটা কী।

ব্যস, মারমুখো হয়ে উঠেছে চিনারা। হুমকি দিয়ে বলেছে, এই মুহূর্তে বেস ক্যাম্প ছেড়ে না গেলে পরে আর প্রাণ নিয়ে

ফিরতে পারবে না।

কথাটা শুনে নিজের উপর রাগ হয়েছে কায়েসের, পিস্তলটা সঙ্গে করে আনেনি বলে। তবে একটু পরেই বুঝল, না এনে ভালই করেছে।

সেই ভারতীয় ভদ্রলোক তাদের হুমকি অগ্রাহ্য করে পাহাড়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, ইঙ্গিতে কায়েসকে পিছু নিতে বলে উঠতেও শুরু করে দিলেন তিনি। চিনাদের আসল চেহারা বেরিয়ে এল ঠিক তখনই। তিন-চারজন একযোগে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে, পাঁচ-সাতটা ফাঁকা আওয়াজ করে জানিয়ে দিল তাদের কথা অমান্য করা হলে পরিণতি সত্যি ভাল হবে না।

ভারতীয় ভদ্রলোকসহ বাকি সবাই ভয় পেয়ে দ্রুত বেস ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছেন। কায়েসও কিছু দূর পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ছিল, কিন্তু বেস ক্যাম্প চোখের আড়ালে হারিয়ে যেতেই আরেক দিক থেকে পাহাড়ে চড়তে শুরু করেছে ও। পাহাড়ে দু'দিন কাটাবার জন্য যা যা লাগার কথা সবই আছে সঙ্গে, কাজেই জানে, ওর কোনও সমস্যা হবে না।

তা হচ্ছেও না। তবে পাহাড়ে উঠতে দিতে না চাওয়ার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে সেটা এখনও কায়েসের বোধগম্য হচ্ছে না। প্রশ্নটা খোঁচাচ্ছে ওকে।

গুণ্ডাগুলোকে কুখ্যাত টং-এর লোক বলে মনে হয়েছে ওর। প্রচুর সংখ্যায় চিনা যেখানে থাকবে, টং-এরও সেখানে শাখা গজাবে। সে যাই হোক, ভাবল কায়েস, অকারণে কিংবা সামান্য কারণে ওদের ওরকম সিরিয়াস হয়ে ওঠার কথা নয়।

দশ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো কায়েস। এবং অন্যমনস্ক থাকায় পথ ভুল করল। সরু ট্রেইল ধরে মিনিট কয়েক হাঁটার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। কারণ সামনে ট্রেইলের আর কোনও অস্তিত্বই নেই। ভ্রূ কুঁচকে এদিক ওদিক

তাকাচ্ছে, ডানদিকে পাহাড়প্রাচীরের গায়ে একটা ফাঁক দেখতে পেল।

পাথুরে জমিনের আঁকাবাঁকা ফাটলে কিছু কাঁটা-ঝোপ জন্মেছে, সেগুলো টপকে সেদিকে এগোল কায়েস। বিশ-ত্রিশ গজ এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। সামনে আর কিছু নেই, ঝপ করে নেমে গেছে পাহাড়ের গা।

অনেক নীচে সবুজ উপত্যকা দেখা যাচ্ছে, ঘন বনভূমিতে ঢাকা। সবুজ সেই চাদরের গায়ে রোদ লাগায় কী যেন একটা ঝিক্ করে উঠল। গলায় ঝুলছে বিনকিউলার, দু-হাতে ধরে সেটাকে চোখে তুলল ও।

বহুদূরে একটা নদী দেখা যাচ্ছে। ওটা নিশ্চয়ই পিং নদী, ব্যাংকক হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে। তারপর, বনভূমির মাঝখানে, বিশাল একটা দুর্গ দেখতে পেল কায়েস। কিন্তু রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল কী ওটা?

হঠাৎ চমকে উঠল কায়েস। এ কী সর্বনাশ! এ তো কল্পনারও অতীত! হায় হায়, এখন কী হবে?

নিশ্চয়ই ভুল দেখছি, ভাবল সে। চোখ রগড়ে আবার তাকাল।

না, সেই একই দৃশ্য দেখতে পেল – সরাসরি নীচের উপত্যকায়, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা জেট প্লেন; ধূসর সবুজ রঙের প্লেনটার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে: **দুরন্ত ঈগল, বাংলাদেশ এয়ারফোর্স** – এয়ারফোর্সের লোগোটাও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে।

ঢাকায় নিউজ ব্ল্যাকআউট আরোপ করায় মিডিয়ায় খবরটা আসেনি, ফলে কায়েসের জানা নেই দুদিন আগে ঢাকা বিমানবন্দর ও বনানী ডিপ্লোম্যাটিক জোনে কী ঘটেছে।

দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথার ভিতর। চিনারা, অর্থাৎ থাই টং কি তা হলে এ-জন্যই দোই ইনথানন পাহাড়ে কাউকে উঠতে

দিচ্ছে না? ভয় পাচ্ছে লুকিয়ে রাখা বাংলাদেশী প্লেনটা দেখে ফেলবে কেউ? সন্দেহ নেই, এর মধ্যে বিরাট কোনও রহস্য আছে। চিন সরকার বাংলাদেশকে দুটো ঈগল উপহার দিয়েছে, একথা ওর জানা আছে। এটা নিশ্চয়ই তাদের একটা – কিন্তু কি কারণে ঈগলের আগে ‘দুরন্ত’ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, জানা নেই ওর।

ঝটপট ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করল কায়েস, দ্রুত হাতে টেলিফটো লেন্স ফিট করল তাতে, তারপর দুরন্ত ঈগলের কয়েকটা ফটো তুলল।

সিদ্ধান্ত নিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকায় রিপোর্ট করা দরকার। চট্ করে একবার হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলাল। দুপুর আড়াইটা বাজতে চলেছে। এখনই ফিরতি ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করলে বেস ক্যাম্পকে এড়িয়ে নিজের হোটেল স্যুইটে পৌঁছাতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয় ওর। থাই সময় সাড়ে পাঁচটা মানে বাংলাদেশ সময় সাড়ে চারটে।

কায়েস জানে দেশে থাকলে ওর মাসুদ ভাইকে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। সিদ্ধান্ত নিল, হোটেলে ফিরে নিজের স্যুইট থেকে সরাসরি ফোন করবে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে।

তবে মোহনাকে ফোন করবে পাহাড় থেকে নীচে নেমেই, কোনও পাবলিক ফোন বুদ থেকে। এখানে কী দেখেছে টেলিফোনে তাকে কিছু বলবার দরকার নেই, শুধু বলবে আজ সন্ধ্যার হেলিকপ্টার সার্ভিস ধরে রাতেই হোটেল নন্দনকাননে পৌঁছে যাও, এখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

চোখে বিনকিউলার তুলে দুরন্ত ঈগলকে শেষ আরেকবার দেখে নিল কায়েস। না, কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে না। ঘুরল ও, পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল।

নামাটা সহজ, বেস ক্যাম্পকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে

পাহাড়ের নীচে নেমে আসতে মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় লাগল কায়েসের। নামবার পথে কারও সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ধরে নিল কেউ ওকে দেখতে পায়নি। যদি জানত চোখে বিনকিউলার তুলে গোটা এলাকার উপর নজর রাখছে থাই টং-এর চিনারা, তা হলে হয়তো আরও একটু সাবধান হত ও।

*

ঢাকা, বিসিআই হেডকোয়ার্টার। বিকেল চারটে।

ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে আছে রানা। মনে মনে প্ল্যান করছে মানসিক ও শারীরিক শিথিলায়ন-এর জন্য ঠিক কী করা দরকার।

সোহেল অফিসে নেই, কাজেই আজ আর গল্প জমবে না। কী একটা কাজ আছে বলে দুপুরবেলাই ছুটি নিয়ে চলে গেছে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি তনিমাও।

কোনও ক্লাবে সাঁতার কাটতে যাওয়া যায়...ভাগ্য ভাল হলে সুইমিংপুলেই দেখা হয়ে যেতে পারে উদ্ভিন্নযৌবনা কোনও তন্বী তরুণীর, দেশি হোক কি বিদেশি...কিংবা তাস খেলতে বসে যেতে পারে, টেবিলে থাকবে হুইস্কির একটা আধ-খালি গ্লাস...

নিজেকে ধমক দিল রানা – এই ব্যাটা, আসলে ঠিক কী চাইছিস তুই?

যার যা কাজ, উপলব্ধি করল রানা, ওর আসলে দুর্দান্ত একটা অ্যাসাইনমেন্ট দরকার। প্রতি পদে মৃত্যুর হাতছানি দেখতে চায় ও, মাথার ভিতর থাকা চাই দেশকে বিপদমুক্ত করবার কঠিন প্রতিজ্ঞা, প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে হবে রোমাঞ্চ ও শিহরন।

কিন্তু কোথায় পাবে রানা অমন গা গরম করা একটা অ্যাসাইনমেন্ট? অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার মালিক তো একজনই, কিন্তু কে জানে কী নিয়ে গত দুদিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে বসে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি মিটিং করছেন তিনি।

গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। কেউ কিচ্ছু বলছে না।

চিন্তা করে যখন অবসাদ দূর করবার কোনও উপায় বেরুল না, হতাশায় আরও কাহিল হয়ে পড়ল রানা। এই সময় ইন্টারকম বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ও। রাহাত খানের ভারি গলার আওয়াজ এক নিমেষে সজাগ ও সতর্ক করে তুলল ওকে। কোথায় গেল ক্লান্তি, কোথায় হতাশা, সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে এখন শুধু চাপা উত্তেজনা ও শিরশিরে রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

'রানা?' বিসিআই চিফ প্রশ্ন করলেন।

'ইয়েস, সার!'

'এখনই একবার আমার চেম্বারে চলে এসো,' ভারী গলায় বললেন বস্।

'জী, সার,' বলল রানা, যদিও ততক্ষণে যোগাযোগ কেটে দিয়েছেন রাহাত খান। 'ইয়েস!' হিসহিস করে বলল ও, মুঠো করা হাতটা শূন্যে ঝাঁকাল বার কয়েক। মনের আশা পূরণ হতে যাচ্ছে ভেবে রীতিমত উল্লসিত। 'ইয়েস! দিস ইজ ইট!'

সব সেই আগের মতই আছে – কাঁচাপাকা ঘন ভ্রূর জঙ্গলে লুকানো সেই ত্রিকালদর্শী একজোড়া চোখ, ভারী ফ্রেমের চশমার পিছন থেকে যেন অন্তর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন; হাতের পাইপ তুলতে যাচ্ছেন মুখে, চোখে ধোঁয়া লাগায় মাথাটা একটু কাত করলেন; এমনকী কপালের পাশে শিরাটাও যেন নিয়ম ধরেই লাফাচ্ছে; তারপরও পেরেকের মত শক্ত মানুষটিকে চিনতে এক সেকেন্ড বেশি সময় লাগল রানার।

রানা উপলব্ধি করল, হঠাৎ কী করে যেন বসের বয়স একলাফে অনেকটা বেড়ে গেছে।

'বসো,' প্রিয় এজেন্টকে চেম্বারে ঢুকতে দেখে বললেন রাহাত খান।

খালি চেয়ারটায় বসল রানা। শিরদাঁড়া খাড়া।

'বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা বেগম সম্পর্কে কিছু জানো?' বসতে না

বসতে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'জী-না, সার,' বলল রানা।

'এটা পড়ো,' বলে রানার সামনে একটা ফাইল রাখলেন বিসিআই চিফ, তারপর রানাকে আর কোনও প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে একটা ফোল্ডার টেনে নিয়ে ডুবে গেলেন সেটার ভিতর।

ফাইলটা কাছে টেনে আনল রানা। উপরে লেখা রয়েছে: টপ সিক্রেট। খুলে পড়তে শুরু করল ও।

ডক্টর নাদিরা বেগম। ফটোটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, চেহারায় স্পষ্ট আভিজাত্য।

বহুমুখী বিরল প্রতিভার অধিকারী ভদ্রমহিলা, বিজ্ঞানের বহু শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। ঢাকা ভার্সিটি থেকে ফিজিক্স নিয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন। সব পরীক্ষাতেই অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট করায় কয়েকটা দেশ থেকে স্কলারশিপ অফার করা হয় তাঁকে। তবে তিনি নিজে কিছুটা বাম-ঘেঁষা বলে লালচিনের প্রস্তাবটাই পছন্দ হয় তাঁর।

বেইজিং ভার্সিটিতে ন্যানো টেকনলজি ও অ্যাটম ফিউজিং লেযার নিয়ে পড়াশোনার পর ওখানেই গবেষণার কাজে হাত দেন ডক্টর নাদিরা। তখন থেকেই তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের কথা প্রকাশ পেতে শুরু করে। একের পর এক বিচিত্র বিষয়ে তাঁর বিস্ময়কর সাফল্যে তাজ্জব বনে যান চিনা বিজ্ঞানীরা।

তাঁদের সুপারিশে চিন সরকার ডক্টর নাদিরাকে নাগরিকত্ব গ্রহণ করবার অনুরোধ করেন। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেন তিনি। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল গবেষণার কাজগুলো দেশে ফিরে করবেন। ঢাকায় বেড়াতে এসে ব্যাপারটা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপও করেন তিনি। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয় – চিনে কাজের সুযোগ আছে, সিকিউরিটিও খুব ভাল, গেস্ট হিসাবে যেমন কাজ করছেন আপাতত করে

যান। সেটা পনেরো বছর আগের কথা।

সে সময় বেইজিং সরকারের টপ সিক্রেট একটা প্রজেক্টের ডিরেক্টর ও চিফ ডিজাইনার হিসাবে নিয়োগ পান ডক্টর নাদিরা।

সেই প্রজেক্টেরই চমকপ্রদ ফলশ্রুতি হলো জেট প্লেন ঈগল। আধুনিক প্রযুক্তির জাদু দেখিয়ে দিয়েছে ওটা, যেমন – যেভাবেই লুকিয়ে রাখা হোক না কেন অ্যাডভান্সড সার্চ রেইডার সিস্টেমের সাহায্যে শত্রুপক্ষের যুদ্ধবিমান ও মিসাইল সহজেই ডিটেক্ট করতে পারবে ওটা, যে-কোনও রেইডার সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে উড়তে পারবে, যে-কোনও জেট প্লেনের চেয়ে স্পিড অনেক বেশি, সৌরশক্তিতেও চলতে পারে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করে মহাশূন্যের বেশ কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে, অনায়াসে হিট-সিকিং মিসাইলকে ফাঁকি দিতে পারে ইত্যাদি।

শুরু থেকেই চিন সরকারের এই টপ সিক্রেট প্রজেক্টের উপর সুপার পাওয়ারগুলোর গভীর আগ্রহ ও তীক্ষ্ণ নজর ছিল। প্রজেক্ট সাইট পেনিট্রেট করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেনি ওরা। কিন্তু চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের কড়া নজরদারির কারণে ওদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তবে তৃতীয় কারও মাধ্যমে ডক্টর নাদিরাকে লোভনীয় সব প্রস্ত াব পাঠানোর প্রতিযোগিতা চলতেই থাকে। প্রতি মাসে কয়েক লাখ ডলার বেতন, দামি গাড়ি, বাগান ও সুইমিংপুলসহ বিশাল অট্টালিকা, ব্যক্তিগত বিমান, যখন যা খুশি তা-ই নিয়ে রিসার্চ করবার ফ্যাসিলিটি ইত্যাদি আরও কত কী – ইচ্ছে করলেই পেতে পারেন তিনি। কিন্তু কোনও প্রস্তাবেই রাজি করানো যায়নি তাঁকে। আদর্শ ও নীতির সঙ্গে কোনওদিন তিনি আপস করেননি, করবেনও না।

পদার্থ বিজ্ঞানে বিরাট অবদান রাখার কারণে গত বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে, বিশেষ করে একটি পরাশক্তির তরফ থেকে, নোবেল প্রাইজ কমিটিকে সুপারিশ করা হয়েছিল ডক্টর নাদিরাকে

যাতে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ওটাও আসলে টোপ ছিল। পরাশক্তিগুলো ভেবেছিল নোবেল প্রাইজের লোভে ডক্টর নাদিরা হয়তো চিন ত্যাগ করে তাদের খপ্পরে এসে যাবেন, তখন তাঁকে নানান কৌশলে পশ্চিমা বিশ্বে রেখে দেয়ার চেষ্টা করা সহজ হবে। কিন্তু টোপটা গেলেননি তিনি।

টপ সিক্রেট প্রজেক্ট সফল হওয়ার পর পরাশক্তির অতি-আগ্রহ প্রশমনের জন্য চিন সরকার তাদের তৈরি ঈগল বেশ কয়েকটি দেশের কাছে বিক্রি করেছে, ফলে এ বিষয়ে সুপারপাওয়ারগুলোর আর তেমন জোরালো আগ্রহ নেই।

মাস কয়েক আগে বাংলাদেশকে দুটো ঈগল জেট উপহার দিয়েছে চিন সরকার। প্রতিটি প্লেনের সঙ্গে তিনজন করে ক্রু এসেছে, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ক্রুদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। গত মাসে ছুটি নিয়ে ডক্টর নাদিরাও এসেছেন ঢাকায়। হঠাৎই একটা আইডিয়া খেলল তাঁর মাথায়।

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল [অব] রাহাত খান ডক্টর নাদিরার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হন, পরামর্শ করবার জন্য তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করলেন ভদ্রমহিলা। কুশলাদি বিনিময়ের পর রাহাত খানকে বললেন – তাঁর মনে হচ্ছে: এখানে প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে, ঈগল জেটকে আরও অনেক ডেভেলপ করে এমন এক দুরন্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সারা দুনিয়ায় যার কোনও জুড়ি অন্তত আগামী পঁচিশ বছরে পাওয়া যাবে না। তাঁর মাথায় দারুণ সব আইডিয়া আসছে, এখুনি কাজটা না ধরলে হারিয়ে যাবে সবগুলো।

কিন্তু লালচিনকে নিয়ে তিনি দ্বিধায় ভুগছেন। ঈগল ওঁদের প্লেন, ডেভেলপ করতে চাইলে পারমিশন নিতে হবে। আর পারমিশন চাইতে গেলেই ওঁরা বলবেন, আমাদের এখানে সিকিউরিটি খুব ভাল, ফ্যাসিলিটিজও এ-প্লাস, কাজেই ডেভলপের কাজটা আপনি বেইজিং-এ এসেই করুন। কিন্তু ততদিনে

আইডিয়াগুলো যদি মাথা থেকে বেরিয়ে যায়?

বিসিআই চিফকে ডক্টর নাদিরা আরও বললেন, এই কাজ তিনি করতে চান পৃথিবীতে সামরিক ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর গোটা দুনিয়ার উপর মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছে একটিমাত্র পরাশক্তি, কারও তোয়াক্কা না করে, কারও প্রতিবাদে কান না দিয়ে যা খুশি তাই একের পর এক অন্যায় করে যাচ্ছে ওরা। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হলে ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা দরকার। ঈগলকে ডেভেলপ করার তাঁর চেষ্টা সফল হলে সেই ভারসাম্য অনেকটাই অর্জিত হবে।

সব কথা শোনার পর রাহাত খান ডক্টর নাদিরাকে বললেন, তা হলে কাজটা তুমি আমাদের এখানেই করো। আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর চিনের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফের সঙ্গে কথা বলছি।

ডক্টর নাদিরা জানতে চাইলেন, প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটি আর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে?

রাহাত খান বললেন, সব আমি দেখছি। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা গেলেই জানাব আমি তোমাকে।

সেদিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন তিনি, এয়ারফোর্স ও সেনাবাহিনীর সিকিউরিটি চিফের সঙ্গে বৈঠক করলেন। ঠিক হলো, ঈগল দুটো যেখানে আছে সেখানেই ডেভেলপ করবার কাজ শুরু হবে, যন্ত্রপাতি যা যা দরকার সব ওখানেই সাপ্লাই দেওয়া হবে ডক্টর নাদিরাকে। এবং ওখানে তিনি কী করছেন তা কাউকে জানানো হবে না, এমনকী সিকিউরিটি গার্ডরা পর্যন্ত কেউ কিছু জানবে না।

পরদিন মহাচিনের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফ-এর সঙ্গে ওয়ায়েরলেসে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বললেন রাহাত খান।

ঈগলকে ডেভেলপ করবার জন্য চিন সরকারের পারমিশন চাইলেন তিনি। বললেন, বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরার এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে ওই দুরন্ত ঈগলের কল্যাণে মহাচিন পৃথিবীর সেরা দুই সামরিক শক্তির একটিতে পরিণত হবে।

যারপরনাই খুশি হলেন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফ। প্রবল উৎসাহে বললেন, 'দেরি না করে ডক্টর নাদিরাকে আজই বেইজিঙে পাঠিয়ে দিন। মনে করুন ফুলের মালা নিয়ে বেইজিং এয়ারপোর্টে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা।'

উত্তরে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে রাহাত খান বললেন, 'ডক্টর নাদিরার আইডিয়াটা আদৌ কাজ করবে কি না জানার জন্য ঢাকাতে, এখনই কাজ শুরু করা দরকার। আইডিয়াটা ভুলও হতে পারে। কাজটা তাঁকে করতে হবে কয়েকটা ধাপে, প্রথমটায় ব্যর্থ হলে বুঝতে হবে হলো না।'

অগত্যা মহাচিনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় নিলেন সামরিক ইন্টেলিজেন্স চিফ, তারপর জানালেন, 'বেশ, তিনি যেমন চাইছেন, তেমনই হোক।'

এরপর সিকিউরিটি সংক্রান্ত টেকনিকাল কিছু ব্যাপার নিয়ে ইন্টেলিজেন্স চিফের সঙ্গে কথা হলো রাহাত খানের। ঈগলকে কতখানি ডেভেলপ করা সম্ভব সে-সম্পর্কেও আভাসে-ইঙ্গিতে আলাপ করলেন ওঁরা।

এরপর দেড়টি মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন ডক্টর নাদিরা। মহাচিনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া দুটো ঈগলের একটার উপর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে বুঝতে পেরেছেন নাদিরা, সফল হতে চলেছেন তিনি। প্রায় সব কাজই শেষ, যেটুকু বাকি আছে সেটা বেইজিঙে গিয়ে সারবেন বলে ভাবছেন তিনি এখন।

ফাইলটা এখানেই শেষ। রানার মনে হলো, অসমাপ্ত। মুখ তুলে বসের দিকে তাকাল ও। 'জী, সার, পড়লাম,' বলল ও।

হাতের ফোল্ডার বন্ধ করে রানার দিকে তাকালেন বিসিআই

চিফ। ম্লান ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ‘সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সেদিন আমার সঙ্গে চাইনিজ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফের আলাপ ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছিল, রানা,’ গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। ‘একটা পরাশক্তি প্রথম থেকেই জানত ছুটিতে ডক্টর নাদিরা কী করতে চাইছেন, কোথায় করতে যাচ্ছেন।’

‘ইয়াল্লা!’ বিড়বিড় করল রানা।

‘বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। নিউজ ব্ল্যাকআউট চলছে, তাই মিডিয়ায় কিছু আসেনি। গতপরশু রাতে হ্যাঙ্গারের ভেতর ওই দুরন্ত ঈগলে আগুন দেয়া হয়েছে,’ কর্কশ ও কঠিন শোনাচ্ছে বিসিআই চিফের কণ্ঠস্বর। ‘অক্ষত কিছুই পাওয়া যায়নি ওটার। আর ঠিক একই সময়ে কিডন্যাপ করা হয়েছে ডক্টর নাদিরাকে।’

হাঁ করে বসের মুখের দিকে চেয়ে রইল মাসুদ রানা।

সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা রানাকে জানালেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী মনে হচ্ছে বলো।’

ঘাবড়ে গেছে ঘটনা শুনে। বলল, ‘অনেক কিছুই দুর্বোধ্য লাগছে, সার।’

‘যেমন?’ সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন রাহাত খান।

‘এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ প্লেনটাকে কেউ ধ্বংস করতে চাইবে কেন, সার? নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে সেটার পেছনে বরং যুক্তি পাওয়া যায়।’

‘আর কী দুর্বোধ্য লাগছে তোমার?’ জানতে চাইলেন বস্।

‘থাই থান্ডার বাংলাদেশে ড্রাগস পাঠায়, সার; তা-ও খুব বড় স্কেলে নয়। ওরা এত বড় একটা কাজে হাত দিতে যাবে কেন? ডক্টর নাদিরার মত বিজ্ঞানীকে নিয়ে ওরা করবেটাই বা কী?’ মাথা নাড়ল রানা। ‘আমার মনে হয় এর পেছনে ওই পরাশক্তির হাত আছে।’

‘হ্যাঁ, ঠিক এই প্রশ্নের উত্তরগুলোই খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে – দুরন্তকে কেন পোড়ানো হলো, থাই থান্ডার কাদের হয়ে কাজটা করল ইত্যাদি,’ বললেন বিসিআই চিফ।

‘এটাই আমার অ্যাসাইনমেন্ট, সার?’

মাথা নাড়লেন রাহাত খান, ভ্রূ কুঁচকে কঠিন চোখে দেখছেন রানাকে। ‘তোমার আসল অ্যাসাইনমেন্ট, যেমন করে পার, ডক্টর নাদিরাকে উদ্ধার করে আনা।’

‘ইয়েস, সার।’

‘এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বিসিআই-এর উচিত সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে ব্যাক করা। কিন্তু সেটি সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, আমারও সন্দেহ, এই ব্যাপারটার সঙ্গে বিশেষ পরাশক্তি জড়িত। ওদের সঙ্গে বিসিআই প্রকাশ্যে বিরোধে জড়াতে পারে না।’

‘জী, সার।’

‘তবে, একটা নির্দেশ এখনই আমি তোমাকে দিয়ে রাখছি,’ ভারী গলায় বললেন রাহাত খান। ‘ওই পরাশক্তি যাকে ঘাঁটাতে ভয় পায়, প্রয়োজনে সেই চিনের সাহায্য নিতে পারবে তুমি।’

‘ইয়েস, সার,’ বলল রানা, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে শুধু বাংলাদেশ বা চিনের নয়, গোটা বিশ্বেরই কত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। ভারসাম্য না থাকলে একতরফা ক্ষমতার দাপট, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, লুটপাট কী ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে, তা তো আমরা বাংলাদেশেই দেখেছি। চোখের সামনে দেখছি শক্তিমদমত্ত পরাশক্তি কেমন পায়ের নীচে পিষছে মানবতাকে। উন্নত বিশ্বেরও কেউ টু শব্দটি করার সাহস পাচ্ছে না। ক্ষমতার এই মহড়া চলতে থাকলে, বাসযোগ্য থাকবে না আর এ পৃথিবী, বাঁচতে চাইলে চাকর হয়ে থাকতে হবে অত্যাচারীদের।

‘সার, কোত্থেকে শুরু করতে বলেন?’ জানতে চাইল রানা। ‘হ্যাঙ্গারে আগুন লাগার পর দুদিন পার হয়ে গেছে, ওখানে...’

‘শুরু করবে থাইল্যান্ড থেকে,’ বললেন রাহাত খান। ‘কারণ

নাহার ভিলার একটা ঝোপের ভেতর থেকে এই ব্রেসলেটটা পাওয়া গেছে।' দেরাজ খুলে প্ল্যাটিনামের ব্রেসলেটটা বের করে রানার দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। 'সম্ভবত আমাদের কোনও সৈনিকের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় থাই থান্ডারদের কারও কবজি থেকে খুলে পড়ে গেছে।'

জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখছে রানা। এ-ধরনের ব্রেসলেট আগেও দেখেছে ও, থাই থান্ডারের সদস্যরা ব্যবহার করে। জিনিসটার গায়ে হরফ খোদাই করে কীসব যেন লেখা হয়েছে। হরফগুলো এত ছোট যে পড়া যাচ্ছে না।

'ওখানে লেখা আছে চক্রি চুয়ান,' চোখাচোখি হতে বললেন রাহাত খান, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেছেন তিনি।

'নামটা পরিচিত, সার!' বলল রানা। 'থাই থান্ডারের দুর্ধর্ষ অপারেটর। দু'বছর আগেই শুনেছিলাম দলের লিডার হতে যাচ্ছে ও।' ওর মনে পড়ল সে-সময় থাই থান্ডারের লিডার ছিল বুকরিত প্রেমজ।'

'ঠিক আছে,' একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুললেন বিসিআই চিফ। অর্থাৎ রানাকে সিগন্যাল দেয়া হলো: এখন তুমি আসতে পার।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। ওর হাতঘড়িতে এখন সাড়ে চারটে বাজে।

পাঁচ

সিঁড়ি বেয়ে সাততলা থেকে ছয়তলায় নেমে নিজের অফিস কামরার দিকে এগোচ্ছে রানা। চৌকাঠ পেরুবার সময় শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে।

আইডি ফোন, নম্বর দেখেই বোঝা গেল বিদেশ থেকে কেউ ফোন করেছে।

নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে রিসিভার তুলল রানা। 'ইয়েস?'

'হ্যালো, মাসুদ ভাই?' অপরপ্রান্ত থেকে পরিচিত ও প্রিয় এক তরুণের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমি ইমরুল কায়েস, থাইল্যান্ড থেকে বলছি।'

প্রথমেই রানার মনে প্রশ্ন জাগল, ব্যাংকক না বলে থাইল্যান্ড বলছে কেন কায়েস? 'হ্যাঁ, বলো, কায়েস। সব খবর ভাল তো? থাইল্যান্ডের কোত্থেকে বলছ তুমি?'

'দোই ইনথানন পাহাড়ের নীচ থেকে, মাসুদ ভাই,' জানাল কায়েস। 'জায়গাটার নাম হাট খোয়াই। নন্দনকানন হোটেলের একটা স্যুইট থেকে জরুরি একটা বিষয়ে রিপোর্ট করছি।'

'আবার বলো,' বলে হাত বাড়িয়ে রেকর্ডিং সুইচটা অন করল রানা।

মেসেজটা রিপিট করল কায়েস, তারপর বলল, 'আমরা কোনও গাইড পাইনি। বেস ক্যাম্পে থাই চিনারা, সম্ভবত টং, বাধা দেয়ায় অন্যদিক থেকে পাহাড়টায় উঠেছিলাম। পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠে পুবদিকে মুখ করে নীচে তাকাতে একটা ঈগল জেট দেখতে পেয়েছি। ওখানে একটা দুর্গ আছে, সেটার কাছ থেকে...'

'কী বাজে বকছ!' চক্কর দিয়ে উঠল রানার মাথা। 'বাংলাদেশী ঈগল ওখানে কীভাবে যাবে? তা কী করে সম্ভব? নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ তুমি।'

'প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল,' বলল কায়েস। 'কিন্তু

পরে বুঝেছি, ঠিকই দেখছি – বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের লোগো আঁকা রয়েছে ওটার গায়ে। আরও নীচে, কী কারণে জানি না বেশ কিছু পাহাড়ী বসতি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মাসুদ ভাই, প্লিজ, আপনি একটু খোঁজ নিন – আমাদের ঈগল হাইজ্যাক হয়ে যায়নি তো?'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা, ভাবল কায়েস এত জোর দিয়ে কথাটা বলছে কীভাবে, শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত না হয়ে? তা হলে কি ওটা ডক্টর নাদিরার ডেভেলপ করা দুরন্ত? 'ওকে, কায়েস, নিচ্ছি খবর,' বলল ও। 'আমি যোগাযোগ না করা পর্যন্ত নন্দনকাননেই থাকো তুমি, ঠিক আছে? আমি–'

হঠাৎ রানাকে হতচকিত করে দিয়ে অপরপ্রান্ত থেকে পর পর দু'তিনটে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ও, বিড়বিড় করছে, 'খোদা! ও খোদা! হ্যালো, কায়েস? হ্যালো? হ্যালো? কায়েস, কী হলো তোমার ... তুমি ঠিক আছ তো?'

কায়েসের অস্ফুট, জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'না, মা-সু-দ ভা-ই, ঠি-ক নেই...থাই টং...' এরপর ঠকাস করে একটা আওয়াজ হলো, সম্ভবত কায়েসের হাত থেকে রিসিভারটা শক্ত কিছুর উপর পড়ে গেছে।

'হ্যালো, কায়েস? হ্যালো...হ্যালো...হ্যালো...' বৃথাই কিছুক্ষণ চেষ্টা করল রানা, কেউ সাড়া দিল না। ডেড হয়ে গেছে লাইন। গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য একটা দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে ওর; ভাবতে চাইছে, চোখ ভিজে যাওয়ায় সামনের দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের ছবিটা ঝাপসা হয়ে ওঠাও সেই দুঃস্বপ্নেরই একটা অংশ মাত্র।

অগত্যা বাধ্য হয়ে ক্রেইডলে রেখে দিল রানা রিসিভার। তারপর আবার তুলে নিয়ে ডায়াল করল ওর এজেন্সির ব্যাংকক শাখার নম্বরে। লাবণী সামাদকে অফিসেই পাওয়া গেল। সংক্ষেপে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল তাকে রানা,

তারপর নির্দেশ দিল – এই মুহূর্তে পুলিশ ও হোটেল নন্দনকাননের সিকিউরিটি চিফকে ফোন করে কায়েসের খবর নিতে বলতে হবে। ওখানকার কোনও হসপিটালেও ফোন করতে হবে, তারা যাতে দ্রুত একটা অ্যামবুলেন্স পাঠায়।

বিশ মিনিট পর রানাকে রিপোর্ট করল লাবণী। ‘সরি, মাসুদ ভাই,’ ধরা গলায় বলল সে। ‘কায়েস ভাই বেঁচে নেই।’

রানা কথা বলছে না।

‘হোটেলের ডাক্তার বলেছেন, এক জোড়া বুলেট কায়েস ভাইয়ের পিঠ দিয়ে ঢুকে দুটো ফুসফুসই ফুটো করে ফেলেছে, আর তৃতীয়টা ঢুকেছে হার্টে।’ আর কিছু বলতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লাবণী।

ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড লাবণীকে কাঁদতে দিল রানা। তারপর নরম গলায় বলল, ‘শান্ত হও, লক্ষ্মীটি। যা বলি, মন দিয়ে শোনো।’

একটু পরেই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল লাবণী। ‘জী, মাসুদ ভাই। বলুন।’

‘ব্যাংকক শাখার সব দায়িত্ব এখন তোমার ওপর,’ বলল রানা। ‘আমার জানামতে হেলিকপ্টার সার্ভিস আছে, সম্ভব হলে আজ রাতেই চলে যাও তোমরা। জায়গাটার নাম হাট খোয়াই।’

‘ওখানে আমাদের কাজ কী, মাসুদ ভাই?’

‘প্রথম কাজ, পোস্টমর্টেম করা হয়ে গেলে এজেন্সির এজেন্টদেরকে লাশটা ব্যাংককে নিয়ে যেতে বলবে,’ বলল রানা। ‘তারপর কফিনটা প্লেনে তুলে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। কায়েসের সঙ্গে প্লেনে কাউকে থাকতে বলে দেবে। তুমি হাট খোয়াইয়েই থাকো, ব্যাংকক হয়ে কাল আমি আসছি ওখানে।’

‘জী, ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,’ ব্যাংকক থেকে জানাল লাবণী।

এরপর বস্‌কে ইন্টারকম করে সব কথা জানাল রানা।

ওর কথা শেষ হতে দশ সেকেন্ড কিছু বললেন না রাহাত

খান। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ ভেসে এল। অবশেষে বললেন, 'ভেরি স্যাড। এর মধ্যে কী যেন একটা ধাঁধা আছে। তোমার অ্যাসাইনমেন্টের গুরুত্বটা আরও অনেক বেড়ে গেল, রানা।'

'জী, সার।'

'তুমি যেহেতু ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সোহেলও ঢাকায় নেই, কায়েসের বাড়িতে খবরটা দেওয়ার জন্যে তা হলে কাউকে পাঠাতে হয়। লাবণীকে বলে দাও কায়েসের লাশটা দেশে পাঠাতে হবে...'

'ওর বাড়িতে খবর দিতে আমিই যাব, সার,' বলল রানা। 'আর লাবণীকে প্রয়োজনীয় সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত কতটুকু এগোল আমি ওখানে পৌঁছে খবর নেব। কিন্তু, সার, কায়েসের কথাটার মানে কী? ইনথাননের পুবদিকে আমাদের ঈগলকে কীভাবে দেখবে ও? যদি সত্যিই দেখে থাকে, তা হলে ওটা দুরন্তই। আসলে ওটা এয়ারপোর্টে পুড়ে যায়নি, নিখোঁজ হয়ে গেছে, এমন কি হতে পারে, সার?'

'না, তা কী করে হবে। দুটো তো মাত্র প্লেন। একটা পুড়ে গেছে, একটা আছে। "এ" সেকশনেরটাই পুড়েছে, যেখানে দুরন্ত ছিল। কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশে "বি" সেকশনেরটা আকাশে উড়ে যায়, উড়িয়ে নিয়ে যায় হ্যাঙ্গারে হাজির ছিল চিনা ক্রুদের যে গ্রুপটা, তারাই। ওড়ার পর সারাক্ষণ এয়ারপোর্টকে ঘিরে চক্কর দিয়েছে ওটা, অনেকেই দেখেছে। তারপর আবার কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ পেয়ে ফিরেও এসেছে, পঁয়তাল্লিশ মিনিট কিংবা এক ঘণ্টার মধ্যে। এর মধ্যে কারও চোখে কোনও রকম অসঙ্গতি ধরা পড়েনি। এ-ব্যাপারে খুঁত শুধু একটাই, তা হলো: চিনাদের তিন ট্রেইনার প্লেন নিয়ে ফিরে আসার পর কোথায় গেছে কেউ বলতে পারছে না।'

'সার, আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না যে কায়েস ভুল দেখেছে,'

বলল রানা। 'ঠিকই দেখেছে ও ঈগলটাকে, আর সেজন্যেই ওকে–' গলাটা ধরে আসায় চুপ করে গেল রানা।

তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বিসিআই চিফ বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আরেকবার খোঁজ নেব।'

'জী, সার; ধন্যবাদ, সার।'

আলাপ শেষ, তারপরও যোগাযোগ কাটছেন না বিসিআই চিফ। 'রানা?'

'ইয়েস, সার?'

'দেশে বর্গি এসে ধান কেটে নিয়ে গেছে। তারপর জানা গেল পা দেওয়া হয়েছে বাঘের লেজেও। বুঝতেই পারছ তোমার কাজ কতটা বাড়ল।' ইঙ্গিতে কথা বলছেন ওস্তাদ, আভাস পেতে চাইছেন প্রিয় শিষ্য তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করতে পারছে কি না।

'জী, সার,' সংক্ষেপে বলল মাসুদ রানা।

ওর কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা লক্ষ করে আংশিক জবাব পেয়ে গেলেন বিসিআই চিফ রাহাত খান। 'কিল দেম, মাই বয়!' এবার ঠাণ্ডা ও কঠিন সুরে পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন তিনি। 'পানিশ দেম অল!'

'আই উইল, সার, আই উইল!'

উদভ্রান্ত রানা নিজের কামরা থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল, যেন এই মুহূর্তে ওকে যুদ্ধে যেতে হবে।

কোনও এক পরাশক্তি মহাচিনের প্রতিবেশী তাইওয়ান-কে নির্দেশ দিয়েছে: যত টাকা লাগে নাও, যেভাবে পার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডক্টর নাদিরা ও তাঁর ডেভেলপ করা দুরন্ত ঈগলটা ঢাকা থেকে এনে দাও। খবরদার, দুটোর একটাও যেন বেজিঙের হাতে না পড়ে!

কাজটা করে দেওয়ার জন্য তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসকে আশি মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছে ওই পরাশক্তি। কাজটা

নিজেরা করবে না, কারণ ধরা পড়ে গেলে লালচিন ভয়ানক খেপে যাবে। তাই আজ্ঞাবহ তাইওয়ানকে দিয়ে করাবে, কিন্তু তাদেরও নিজেদের গা বাঁচিয়ে আর কাউকে দিয়ে করাতে হবে কাজটা। কারণ চিনারা যদি তাইওয়ান আক্রমণ করে বসে, জড়িয়ে যাবে ওরাও আরেক যুদ্ধে।

কাজটার সঙ্গে তিনটে শর্তও দিয়েছে ওরা।

এক: কোনও অবস্থাতেই দুরন্ত ঈগলের কোনও ক্ষতি করা চলবে না।

দুই: অক্ষত অবস্থায় থাইল্যান্ডের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে, সেখানে ওদের টেকনিকাল এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে দেখবে ওটাকে।

তিন: বাঙালী ডক্টর নাদিরাকে ঢাকা থেকে কিডন্যাপ করে পৌঁছে দিতে হবে সিঙ্গাপুরে। ওখানে একটা বোয়িং অপেক্ষা করবে, তাঁকে নিয়ে উড়ে যাবে অজ্ঞাত কোনও গন্তব্যে।

থাইল্যান্ড। দোই ইনথানন।

এই মুহূর্তে শান্ত ও ভদ্র একজন ট্যুরিস্ট মাসুদ রানা, সেই সঙ্গে সৌখিন পর্বতারোহীও বটে। থাই চিনারা কায়েসকে বাধা দিয়েছিল, সে-কথা মনে রেখে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে – প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার আছে শোল্ডার হোলস্টারে। ছুরিটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো বগলের কাছাকাছি বাহুতে, আরও কিছু মারাত্মক অস্ত্র সঙ্গে নিতে বাধ্য করেছেন ওকে বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের চিফ ডক্টর শামশের আলী।

নীল জিনস ও কালো জ্যাকেট পরেছে রানা, পায়ে ক্লাইম্বিং বুট, কাঁধ থেকে ঝুলছে লেদার ব্যাগ। ডান হাতের কবজিতে পরেছে বিসিআই চিফের কাছ থেকে পাওয়া একমাত্র সূত্র সেই ব্রেসলেটটা।

ব্যাংকক থেকে কাল রাতে হাট খোয়াইয়ে পৌঁছেছে রানা।

কাল রাতে ও আজ সকালে কায়েসের খুন প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে দু'দফা কথা হয়েছে ওর, সঙ্গে লাবণীও ছিল। এই কদিন তদন্ত করে কোনও সূত্রই খুঁজে পায়নি তারা। কেসটা সম্পর্কে স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনও রকম আগ্রহও দেখা গেল না। আভাসে-ইঙ্গিতে রানাকে তারা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করল কায়েস সম্ভবত ড্রাগস কিংবা নারী ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে থাই টং-এর হাতে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে তাকে।

রানা জানতে চাইল, থাই টংকে সন্দেহ হওয়ার কারণ কী?

পুলিশ জানাল, এলাকাটা থাই টং-এর, এখানে তাদের নির্দেশ ছাড়া এ-ধরনের কোনও অপরাধ সাধারণত ঘটে না।

রানা জিজ্ঞেস করল, তা হলে তাদেরকে আপনারা ধরছেন না কেন?

ইন্সপেক্টর ম্লান হেসে জবাব দিল, তারা আমাদেরকে ধরছে না, এটাই আমাদের সাত-কপাল। এখানে পাঠানোর আগে হেডকোয়ার্টার থেকে বলে দেওয়া হয়, ওদেরকে ঘাঁটাবার দরকার নেই।

পরিস্থিতিটা বুঝে নিল রানা। যা করবার নিজেদেরই করতে হবে ওদের।

হোটেল-এ ফিরে এসে লাবণীকে ব্যাংককে ফিরে যেতে বলল রানা, কারণ শাখাপ্রধান না থাকায় ওখানকার কাজ ঠিকমত চলবে না।

লাবণীকে হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে দুপুরের দিকে দোই ইনথানন বেস ক্যাম্পে পৌঁছাল রানা। এখানে এসে একটু অবাকই হলো ও। কোথাও কোনও থাই চিনার ছায়ামাত্র নেই। অনেক গাইডকেও ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। অথচ টেলিফোনে কায়েস বলেছিল, কোনও গাইড পাওয়া যায়নি, থাই চিনারা পাহাড়ে চড়তে বাধা দিয়েছে তাকে।

তবে ক্যাম্পের সরকারী লোকজন, গাইড ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল দিন কয়েকের জন্য পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কেন? উত্তরটা এড়িয়ে গেল সবাই।

রানা খেয়াল করল, ওর হাতের ব্রেসলেটটা দেখে লোকজন এড়িয়ে থাকছে ওকে, সামনে পড়ে গেলে যেন পালাতে পারলে বাঁচে। এরপর কারও দিকে এগোবার সময় ডান হাতটা পিছনে রাখল ও, ব্রেসলেটটা যাতে দেখা না যায়।

তাতেও যে খুব একটা লাভ হলো, তা নয়। কী কারণে যেন মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে সবাই। শুধু একজন গাইড চাপা স্বরে বলল, 'ভৌতিক ব্যাপার, সার। আগুনে পুড়ে বেশ কিছু লোক মারা গেছে।'

ওখান থেকে নেমে এসে অন্য পথ খুঁজে নিল রানা; জানে না, ঠিক এটা ধরেই উঠেছিল কায়েস। আকাশে ভাসমান মেঘ থাকায় রোদের অত্যাচার নেই; সরু, আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে উঠতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না ওর। বারো শো ফুট ওঠার পর প্রথম বসতিটা দেখতে পেল ও।

আগুনে পোড়া, পরিত্যক্ত কয়েকটা কুঁড়েঘর। শুধু ঘরগুলো নয়, গাছপালাও পুড়ে গেছে। একটা প্যাটার্ন লক্ষ করল রানা। আগুন যেন চওড়া একটা করিডর তৈরি করতে চেয়েছে। কিছুদূর এভাবে পোড়াবার পর নতুন আরেকদিকে সরে গিয়ে সেখানেও দেড়-দুশো গজ লম্বা একটা করিডর তৈরি করেছে।

গাছপালা এদিকে কম বলে নিজে থেকেই নিভে গেছে আগুন।

দ্বিতীয় বসতিটা আঠারোশো ফুট উপরে, আকারে বেশ বড়, তবে এটায় আগুন লাগেনি। সর্বস্ব হারানো হতচকিত আদিবাসী পাহাড়ী লোকজন আশ্রয় নিয়েছে এখানে। বিশৃংখল ও করুণ একটা অবস্থা দেখতে পেল রানা। আলাপ করবার ইচ্ছে থাকলেও, ভাষা একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। দু'একজন পাওয়া গেল

যারা মাত্র কয়েকটা ইংরেজি শব্দ জানে।

আকার-ইঙ্গিতে তারা বোঝাতে চাইল, সরকার তাদেরকে পাহাড় থেকে উচ্ছেদ করবার জন্য আকাশ থেকে অদৃশ্য আগুন ছুঁড়েছে। রানার প্রশ্নের উত্তরে তারা জানাল, পাঁচশো ফুট উপরে আরও একটা বসতিতে আগুন লেগেছে।

পাঁচশো ফুট ওঠার পর, তিন নম্বর বসতিতে, মাত্র পাঁচজন মানুষ ও পাঁচ-সাতটা ছাগল দেখতে পেল রানা, অথচ ঘর-বাড়ির সংখ্যা দুশোর কম নয়। মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি আধ পোড়া দুটো কুঁড়েঘর থেকে গৃহস্থালির কিছু জিনিস-পত্র উদ্ধার করছে, তাদেরকে সাহায্য করছে গ্রাম্য এক তরুণী ও একজন কামলা।

আরও এক তরুণী কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই পরিবেশের সঙ্গের একেবারেই মানাচ্ছে না তাকে। বাকি সবার মত নোংরা ফতুয়া আর খাটো গাউন পরেনি সে। তার গায়ে সাদা পপলিনের শার্ট, কোমরে হালকা নীল জিনস। যথেষ্ট সুন্দরী সে, তারপরও মেকআপ ব্যবহারে কার্পণ্য নেই।

এ মেয়ে এখানে বাস করে না, ভাবল রানা, আবার এমনও নয় যে নীচে থেকে এই মাত্র পাহাড়ে উঠে এসেছে। তা উঠলে ঘামে মুখের মেকআপ লেপ্টে যেত।

রানা তাকিয়ে আছে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল মেয়েটি। 'বেশ কয়েক জায়গাই দেখছি পুড়ে গেছে,' ইংরেজিতে বলল রানা। 'কীভাবে লাগল এই আগুন?'

মেয়েটি কিছু বলছে না।

তবে হাতের কাজ থামিয়ে তার দিকে তাকাল সবাই, তাও আবার হাত জোড় করে অনুমতি প্রার্থনার ভঙ্গিতে। বিড় বিড় করে কিছু বলল মেয়েটি, শুনে সবাই আবার যে যার কাজে হাত লাগাল – রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে।

'আমাদেরকে বিরক্ত না করলেই খুশি হব,' এক পা এগিয়ে এসে কঠিন সুরে বলল শহুরে তরুণী, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাই

বলে দিচ্ছে আনআর্মড কমব্যাটে ট্রেনিং নেওয়া আছে। বলা যায় না, হাতব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'আমি কাউকে বিরক্ত করতে আসিনি,' বলল রানা। 'এসেছি একটা প্লেনের খোঁজে। আপনি কিছু জানেন?'

'কীসের প্লেন?' ঠাণ্ডা সুরে বলল মেয়েটি। 'নিজের ভাল চান তো কেটে পড়ুন এখান থেকে!'

এই সময় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মধ্যবয়স্কা মহিলাটি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে রানা দেখল মহিলা দৌড়ে গিয়ে ছোট্ট একটা কবরের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। মাটি ও পাথরের স্তূপ দেখেই বোঝা যায়, নতুন কবর – নিশ্চয়ই কোনও শিশুর।

'কার কবর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওই মহিলার ছ'বছরের ছেলে আগুনে পুড়ে মারা গেছে,' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি। 'কেউ জানে না কীভাবে লেগেছে আগুনটা।'

'দুঃখিত,' বলে মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, ট্রেইল ধরে উঠছে।

পাঁচ হাজার ফুটে উঠতে আরও দু'ঘণ্টা লেগে গেল রানার। তারপর হঠাৎ খেয়াল করল, ট্রেইলের আর কোনও অস্তিত্বই নেই সামনে। ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল ডানদিকে পাহাড়প্রাচীরের গায়ে একটা ফাঁক। কাঁটা-ঝোপ টপকে সেদিকে এগোল ও। পঁচিশ গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সামনে ফাঁকা জায়গা, ঝপ্ করে নেমে গেছে পাহাড়ের গা।

জীবনের শেষ টেলিফোন মেসেজে কায়েস তার প্রিয় মাসুদ ভাইকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই দিয়ে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে চোখে শক্তিশালী বিনকিউলার তুলে তার বর্ণনার সঙ্গে দৃশ্যটার হুবহু মিল খুঁজে পেল রানা।

বহুদূরে পিং নদী দেখা যাচ্ছে। রানা জানে, পাঁচশো মাইল দূরে রাজধানী ব্যাংকক হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে ওটা। তারপর,

কায়েস যেমন দেখেছিল, ও-ও তাই দেখল – বনভূমির মাঝখানে বিশাল একটা দুর্গ।

কিন্তু চারদিকে বিনকিউলার ঘুরিয়ে, বারবার ফোকাস অ্যাডজাস্ট করেও কোথাও কোনও প্লেন দেখতে পেল না রানা।

কায়েসের বর্ণনা মত সবই তো রয়েছে, তা হলে প্লেনটা নেই কেন?

প্লেন নেই, আর সেজন্যই কি বেস ক্যাম্পে চিনারাও নেই?

ওখানে বসেই কয়েকটা কাজু বাদাম ও কফি খেল রানা। নদীর দিকে মুখ করা প্রাচীন দুর্গটা এখান থেকে অনেক দূরে, চোখে বিনকিউলার তুলে সেদিকে তাকিয়ে আছে ও। প্রথমে ভেবেছিল প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে দুর্গটা। একটু পরেই ওর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

নদীর ঘাট থেকে রওনা হয়ে ট্রাকের একটা বহরকে আসতে দেখল রানা। ট্রাক বোঝাই কাঠের বাক্সের উপর যারা বসে আছে তাদের মধ্যে থাই লোকজন নেই বললেই চলে, বেশিরভাগই বিদেশি লেবার। চেহারা ও হাবভাব দেখে কয়েকজনকে ভারতীয় ও বাংলাদেশী বলেও মনে হলো ওর।

দুর্গটাকে নিশ্ছিদ্রভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। ফটকটা বিরাট, দশ-বারোজন চিনা কারবাইন হাতে পাহারা দিচ্ছে সেখানে। ফটক খুলে দেওয়া হলো। ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকল ট্রাক বহর। রানা লক্ষ করল শুধু প্রহরীরা নয়, শ্রমিকদের যারা খাটাচ্ছে তারাও সবাই থাই চিনা।

বেলা শেষ হতে খুব আর দেরি নেই। এখানে সময় নষ্ট করবার মানে হয় না। কিছু ফেলে যাচ্ছে কি না দেখে নিয়ে ফিরতি পথ ধরে নীচে নামছে রানা।

ঘণ্টাখানেক পর আগুন লাগা তিন নম্বর বসতিতে পৌঁছে দেখল ছাগলগুলোকে নিয়ে সবাই চলে গেছে, একা শুধু শহুরে মেয়েটি একটা ছোট বোল্ডারের উপর বসে রয়েছে। তার হাতে

একটা ছোট লাঠি, সেটা দিয়ে কালো ছাই নাড়ছে। ভঙ্গিটা এমন, যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছে সে।

থেমে দাঁড়িয়ে চারপাশটা ভাল করে একবার দেখে নিচ্ছে রানা, বুঝতে চাইছে এটা কোনও ফাঁদ কি না।

দুশো ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, মেয়েটির ডান পাশে অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা গোলাঘর। দেখে খালিই মনে হলো। রাতটা কি ওখানেই কাটাবার কথা ভাবছে মেয়েটি? ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত, লক্ষ করল ও।

'ও, আপনি,' বোল্ডারের উপর সিধে হয়ে বসল মেয়েটি। 'আমি ভাবলাম অন্য দিক দিয়ে নেমে গেছেন।'

'এখানে আপনি একা...আপনার আসলে সূর্য ডোবার আগেই চলে যাওয়া উচিত,' বলল রানা।

হেসে উঠল মেয়েটি, তারপর বলল, 'এটা আমাদের রাজ্য। আমি আদিবাসী এক রাজার মেয়ে। প্রজাদের বাড়ি-ঘরে আগুন লেগেছে শুনে দেখতে এসেছি। কেউ বললেই এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে নাকি?'

আচ্ছা, ভাবল রানা, মেয়েটিকে আদিবাসী মানুষগুলো যে ভক্তি ও সম্মান দেখাচ্ছিল তার কারণটা বোঝা গেল। 'দুঃখিত, আমি সেরকম কিছু বোঝাতে চাইনি...'

'তা হলে কী বোঝাতে চেয়েছেন?' বোল্ডার থেকে নেমে পড়ল মেয়েটি, দৃঢ় অথচ শান্ত ভঙ্গিতে মুখোমুখি হলো রানার। 'কে আপনি?' চট করে আরেকবার দেখে নিল ওর হাতে পরা ব্রেসলেটটা। 'থাই থান্ডার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমাকে দেখে থাই বলে মনে হয়?'

'তা মনে না হলেও, হাতের ওই ডিজাইনের ব্রেসলেট থাই থান্ডারের উপরের সারির নেতারা ছাড়া আর কেউ পরে না,' বলল মেয়েটি। 'না জেনে পরে থাকলে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলুন, কারণ

এটা থাই থান্ডারের এলাকা নয়।'

'জানি, এটা থাই টং-এর এলাকা,' বলল রানা।

'এও কি জানেন যে থাই থান্ডারের সঙ্গে থাই টং-এর একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে?' একটু তীক্ষ্ণ হলো মেয়েটির কণ্ঠস্বর। 'ওটা পরা অবস্থায় আপনাকে দেখলে,' গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গি করে দেখাল সে, 'থাই টং স্রেফ জবাই করে ফেলবে আপনাকে?'

'এতই সিরিয়াস দ্বন্দ্ব?' রানা ভাবল – আমার তথ্য চাই! 'কী নিয়ে বলুন তো?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল মেয়েটি।

'ব্রেসলেটটা ইচ্ছে করেই পরে আছি,' বলল রানা। 'থাই থান্ডার দেখে যাতে কেউ এগিয়ে আসে। ওদেরকে খুঁজছি আমি।'

'ওদেরকে খুঁজছেন? কেন, আপনার কি মরার শখ হয়েছে?'

রানা হাসল না। 'সত্যি কথা বলতে কী, উল্টোটাই বরং সত্যি।'

জবাব শুনে এক মুহূর্ত একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি উত্তরা, উত্তরা উৎকর্ণা।'

'আমি মাসুদ রানা,' উত্তরার হাতটা ধরে বলল রানা। 'বাংলাদেশী।'

'কিন্তু ট্যুরিস্ট নন,' মন্তব্য করল উত্তরা।

'বেশ বুঝতে পারছি অনেক কিছুই জানেন আপনি,' বলল রানা। 'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'

যেন প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবেন? গোলাঘরে ব্যবস্থা আছে।'

তার পিছু নিয়ে বড়সড় গোলাঘরটায় ঢুকল রানা। প্রচুর খড় রয়েছে। এমনকী রশি দিয়ে তৈরি একটা দোলনাও আছে, যেটায় শুয়ে রাত কাটানো যায়। একধারে কিছু চাদর, কম্বল, বালিশ ইত্যাদি স্তূপ করা।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, ‘কাল থেকে আছি এখানে। আরও দু’একদিন থাকতে হতে পারে। নায়েব টাকা-পয়সা নিয়ে এলে প্রজাদের মধ্যে বিলি করব। ঘর-বাড়ি বানাতে না পারলে ওরা থাকবে কোথায়।’

‘আপনি রাজার মেয়ে, ঠিক আছে,’ বলল রানা। ‘কেন যেন মনে হচ্ছে সেটাই আপনার একমাত্র পরিচয় নয়।’

মাটির একটা চুলোয় আগুন জ্বলছে, পাতিলে গরম হচ্ছে খানিকটা পানি। কাঠের একটা বাক্সে বসে চা বানাচ্ছে উত্তরা। ইঙ্গিতে পাশের বাক্সটায় বসতে বলল রানাকে।

‘ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছি, আগুনটা লাগল কীভবে?’ জানতে চাইল রানা।

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল উত্তরা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর মেয়েটিকে চমকে দেওয়ার জন্য হঠাৎ জানতে চাইল, ‘প্লেনটা ওখানে নেই কেন?’

চা ভর্তি মাটির কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল উত্তরা। ‘আচ্ছা, বোঝা গেল,’ বলল সে। ‘আপনি ওই বিশেষ দেশের লোক নন, ওদের ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাও নন।’

‘যদি বলি আমি বিসিআই, তা হলে কি কিছু বুঝবেন?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘হয়তো বুঝব, কিন্তু বুঝতে মানা আছে – নির্দেশ আছে চোখ-কান বুজে থাকতে হবে।’

‘মানা আছে?’ কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘ধাঁধায় ফেলে দিলেন।’

এ প্রসঙ্গে কিছু বললই না উত্তরা। বলল, ‘আমার ধারণা, প্লেনটা ওখানেই কোথাও আছে। ভাল করে খুঁজলে ঠিকই পাওয়া যাবে।’

‘কী প্লেন ওটা?’ সাবধানে জানতে চাইল রানা। ‘কবে, কোত্থেকে এল?’

‘এত কথা সত্যি আমি জানি না,’ বলল উত্তরা। ‘শুধু জানি

ওটা বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের খুব দামী একটা জেট। আমাদের অফিসে কেউ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতেই রাজি নয়...' চেহারা দেখে বোঝা গেল মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে কথাটা।

'সরি? আপনাদের অফিস?'

'প্লিজ, এ প্রসঙ্গে আমাকে কোনও প্রশ্ন করবেন না।' সামান্য হলেও বিচলিত দেখাল মেয়েটিকে।

'বেশ, অফিস সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করব না। তবে বাংলাদেশ সরকারের একজন অফিসার হিসেবে আমার জানার অধিকার আছে, আপনি কীভাবে জানলেন ওটা আমাদের এয়ারফোর্সের জেট?'

'আমি ওটার ফটো দেখেছি,' ধীরে ধীরে বলল উত্তরা। 'ধূসর সবুজ রঙের প্লেনটার গায়ে লেখা আছে – বাংলাদেশ এয়ারফোর্স, দুরন্ত ঈগল। দোই ইনথাননের ওপর থেকে তোলা। কোনও সন্দেহ নেই, কারণ বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের লোগোটাও পরিষ্কার চেনা যায়।'

রানার দম আটকে এল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ফটোটা আমাকে একবার দেখাবেন, প্লিজ?'

'দুঃখিত,' বলে মাথা নাড়ল উত্তরা। 'আমার কাছে নেই ওটা।'

'কার কাছে আছে?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কার কাছে আছে জেনে কোনও লাভ নেই,' বলল উত্তরা। 'আপনি তার নাগাল পাবেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'দুর্গটা সম্পর্কে বলুন। কিছু ট্রাক, বিদেশি শ্রমিক, চিনা লোকজন দেখলাম ওখানে।'

'ওটা ব্যান সপ দুর্গ, জিকো তানাই-এর আস্তানা।'

নামটা চেনা চেনা লাগল রানার, তবে ঠিক স্মরণ করতে পারল না কোথায় শুনেছে।

‘জিকো তানাই থাই টং-এর চিফ,’ বলল উত্তরা। ‘খুন, নারীব্যবসা, ব্ল্যাকমেইল, ড্রাগস পাচার, ট্রেন্ডারবাজি – মোট কথা, এমন কোনও অপরাধ নেই যা সে করে না। এত কিছুর পর সে একজন মউজুদদারও। দুর্গটা দুর্ভেদ্য, সহজে ঢুকতে পারবেন না।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘তবে আপনি যদি প্লেনটার খোঁজে এসে থাকেন, আমার ধারণা সেটা আপনি ওখানেই পাবেন।’

‘সহজ না হোক, ঢোকার কোনও উপায় জানা আছে আপনার?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এই পাহাড় ছাড়া এলাকার বাকি অংশ ওদের দখলে,’ বলল উত্তরা। ‘নিজেদের এলাকায় একটা পিন পর্যন্ত গলতে দেয় না ওরা। দুঃখিত, আমি আপনার কোনও সাহায্যে আসব না।’

‘ধন্যবাদ।’

‘আচ্ছা,’ বিদ্রূপটুকু গায়ে না মেখে উত্তরা বলল, ‘ঠিক করে বলুন তো। আপনি কি সত্যি বাংলাদেশী?’

‘সন্দেহ হবার কারণ?’

‘আমার একটা হিসেব আছে, সেটা মিলছে না। আপনি বাংলাদেশী হলে খোঁজ করার কথা টং লিডার জিকো তানাইয়ের সহকারী চাই-পাই দেও-কে।’ উত্তরা আসলে স্বেচ্ছায় কিছু তথ্য দিচ্ছে রানাকে।

সরাসরি জানতে চাইল রানা, ‘তার মানে আপনি বলতে চাইছেন চাই-পাই দেওই ইমরুল কায়েসকে খুন করেছে?’

‘ফটোগুলো তুলেছিল আপনার মতই একজন বাঙালী, আমার এক বান্ধবীর প্রেমিক। তার নামও ইমরুল কায়েস,’ বলল উত্তরা। ‘হতে পারে দুজন একই লোক। আমার পরিচিত এই কায়েসও খুন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দেওই তাকে খুন করেছে বলে শুনেছি।’

‘আচ্ছা! থ্যাঙ্ক ইউ।’

‘দিন, আপনার কাপটা আবার ভরে দিই,’ রানার হাত থেকে

কাপটা নিয়ে তাতে চা ঢালল উত্তরা, ওর দিকে তাকাচ্ছে না।

রানার মন বলছে যতটুকু বলবার ততটুকু নিজেই বলবে মেয়েটি, তার বেশি কিছু আদায় করা যাবে না।

'চাই-পাই দেওকে আপনি পাবেন ব্যাংককে,' বলল উত্তরা। 'পাবেন নোনথাবুরি নদীবন্দরে। ওটা টং-এর লিজ নেয়া বন্দর। কার্গো তোলার তদারকি করাই দেও-এর আসল কাজ, বিশেষ প্রয়োজনে এখানে কদিন ছিল।'

'এত কথা আপনি জানেন কীভাবে?'

'থাই টঙে আমার ইনফরমার আছে। তার কাছেই আমি প্লেনের ফটো দেখেছি। চুরি করে আমাকে দেখাতে এনেছিল, আবার জায়গামত রেখে এসেছে – দুর্গে।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল উত্তরা। 'এখনই যদি রওনা হন, তাও নীচে নামতে রাত হয়ে যাবে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'আপনার আর দেরি করা উচিত হবে না।'

কঠিন মেয়ে, বুঝতে পারছে রানা। বাক্স ছেড়ে উঠল ও।

'চা খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ বেশ কিছু তথ্য দেয়ার জন্যেও। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

'আমাকে নয়, আপনার আসলে দেখা হওয়া দরকার মোহনার সঙ্গে,' বিড়বিড় করে বলল উত্তরা, যেন জনান্তিকে।

'মোহনা? কে সে?'

কথা না বলে রানার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল উত্তরা, তার চোখের পাপড়িগুলো ধীরে ধীরে ভিজে উঠতে দেখছে রানা।

ছয়

কদিন আগের ঘটনা।

রাজধানী ব্যাংকক, থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর হেড অফিস। জেনারেল খোন কায়েন চাও-এর চেম্বার। রিভলভিং চেয়ারে অটল মূর্তির মত বসে আছেন ভদ্রলোক, চোখ-মুখ থমথম করছে।

দেশে এই মুহূর্তে সাতজন এজেন্ট উপস্থিত, জরুরি মিটিঙে তাদের সবাইকে ডেকেছেন চিফ কায়েন চাও। গত কদিনের মধ্যে এ-ধরনের এটা দ্বিতীয় মিটিং। সাতজনকে ডাকা হলেও, আজকের মিটিঙে ছয়জন উপস্থিত। একজনই মাত্র তরুণী, বাকি পাঁচজন তরুণ। এজেন্টরা ছাড়াও টিসিআই-এর অপারেশন্স চিফ সত্যশুভ চুনাভানও উপস্থিত আজকের মিটিঙে।

মিটিঙের শুরুতেই গম্ভীর সুরে জানতে চাইলেন বস্, 'মোহনা কোথায়?'

এক মুহূর্ত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সবাই, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কে মুখ খুলবে।

অবশেষে উত্তরাই জবাব দিল। 'সার, খুব খারাপ কী যেন একটা হয়েছে মোহনার। সে তার অফিসের দরজা বন্ধ করে সারাক্ষণ কাঁদছে। সবাই আমরা কত করে বললাম, কিন্তু দরজা খুলছে না।'

চট করে একবার অপারেশন সেকশনের হেড সত্যশুভ চুনাভানের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন টিসিআই চিফ। চেয়ারে হেলান দিলেন, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর চোখ নামিয়ে দৃষ্টি বুলালেন বিশ্বস্ত এজেন্টদের উপর। 'ওর কী হয়েছে আমি জানি। ওকে তোমরা কেউ বিরক্ত

কোরো না। কাঁদছে, কাঁদতে দাও।'

'কেন, সার?' জিজ্ঞেস করল উত্তরা। 'কী হয়েছে মোহনার?'

'সেটা ওর ব্যক্তিগত বিষয়, এখানে আলোচনা না করাই ভাল,' বললেন চিফ কায়েন চাও। 'এসো, আমরা আমাদের মিটিংটা শুরু করি।'

যে যার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সবাই। মোহনার চেয়ারটা খালিই পড়ে থাকল।

'গতবারের মিটিঙে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, থাইল্যান্ড সম্ভবত দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল একটা সমস্যার মধ্যে পড়তে যাচ্ছে,' শুরু করলেন টিসিআই চিফ। 'আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, চোখের সামনে বিরাট কোনও অন্যায় এবং দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হতে দেখলেও আমাদের হয়তো কিছু করার থাকবে না। ওপরমহল থেকে আমার ওপর নির্দেশ ছিল, এমন কিছু করা চলবে না যাতে দুই পরাশক্তির কারও স্বার্থে আঘাত লাগে। তা করলে এক-নম্বরটির নির্দেশে আমাদের সমস্ত ফরেন এইড তো বন্ধ করে দেওয়া হবেই, প্রয়োজনে প্রচণ্ড আঘাত হানবে তারা বিনা দ্বিধায়, অকাতরে হত্যা করবে মানুষ, গুঁড়িয়ে দেবে আমাদের বড় বড় শহর, রাজধানী। কিছুদিন আগে স্বাধীন কয়েকটি দেশে পেশিশক্তির জোরে একই কাজ করেছে ওরা, এখনও করেই যাচ্ছে; এইমুহূর্তে আরও কয়েকটি দেশকে টার্গেট করে বসে আছে। ওদের পঞ্চম টার্গেট হতে চাই না আমরা।'

এজেন্টরা চুপ করে থাকল, সবার চেহারায় বিষণ্নতার ছায়া।

'যা আশঙ্কা করেছিলাম, তারচেয়েও মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে,' আবার শুরু করলেন টিসিআই চিফ। 'সংশ্লিষ্ট পরাশক্তির পরোক্ষ মদদে থাই থান্ডার আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর একটা অপারেশন চালিয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি আসলে সেই শক্তিধর দেশটির নির্দেশে কয়েক হাত ঘুরে কাজটার দায়িত্ব পায় থাই থান্ডার। আমার মনে হয়, এর সঙ্গে থাই টং, তাইওয়ানিজ

টং ও তাইওয়ানিজ ইন্টেলিজেন্সও...'

মাঝপথে বাধা দেওয়া হলো তাঁকে। কেউ নক করল, কিন্তু অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে একটি মেয়ে ঢুকে পড়ল চেম্বারের ভিতরে।

'এসো, মোহনা,' নরম সুরে বলল অপারেশন্স চিফ সত্যশুভ চুনাভান। 'বসো।'

থাই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হওয়া মেয়ে মোহনা কৃত্তিকাচরণকে দেখে কেউ বলবে না যে এতক্ষণ কাঁদছিল সে। এই মুহূর্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আছে মেয়েটি, চোখ দুটো যেন দু'টুকরো অঙ্গারের মত জ্বলছে।

'আমি বসতে আসিনি,' বলল মোহনা, সরাসরি বসের দিকে তাকিয়ে। 'আপনার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইতে এসেছি, সার।'

চেম্বারের পরিবেশ অকস্মাৎ পিন খোলা গ্রেনেডের মত হয়ে উঠল। টিসিআই চিফের সঙ্গে এই ভাষায় কেউ কখনও কথা বলবার কথা ভাবতেও সাহস পায় না।

তবে ভয়ানক কিছু ঘটল না। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন বস্, অনুরোধের ভঙ্গিতে মোহনাকে বললেন, 'প্লিজ, মাই ডিয়ার লেডি, সিট ডাউন। বিশ্বাস করো, আমি তোমার প্রতি সিনসিয়ারলি সিমপ্যাথেটিক...'

'থামুন, সার,' বাধা দিল মোহনা। 'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি জানতেন না ইমরুল কায়েস রানা এজেন্সির ব্যাংকক শাখার প্রধান? আর রানা এজেন্সি আসলে বিসিআই-এর একটা কাভার?'

'হ্যাঁ, জানতাম। তুমি শান্ত হয়ে বসো, মোহনা...'

'আপনি তো এ-ও জানতেন যে তার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে, কিছুদিনের মধ্যে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম,' বলল মোহনা। 'তা হলে আমাকে আপনি সাবধান করেননি কেন যে ওই এলাকায় বন্ধু দেশের স্পাইদের কেউ

গেলেও থাই টং তাকে খুন করবে?’

‘তুমি আসলে ভুলে গেছ, মোহনা,’ শান্ত কণ্ঠে বললেন টিএসআই চিফ। ‘ওপরমহল থেকে আমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, আমিও তোমাদেরকে সেই নির্দেশই দিয়েছিলাম – এমন কিছু করা চলবে না যাতে সুপারপাওয়ারের স্বার্থে আঘাত লাগে, তা লাগলে পাল্টা আঘাত হানবে তারা।’

‘তাদের স্বার্থে আঘাত লাগার মত কী করেছিল কায়েস?’

‘একটা প্লেনের ফটো তুলেছে ও, টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে বিসিআই হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে।’

‘প্লেন? কী প্লেন?’ কয়েকজন একযোগে জানতে চাইল।

‘সব কথা আমাদের জানা নেই। সবই ভাসা ভাসা। যদি একান্তই জানতে চাও, অপারেশন হেড যতটুকু জানে বলতে পারবে,’ বললেন চিফ কায়েন চাও। ‘তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমরা নিজেদের ঝামেলাই সামাল দিতে পারছি না, অন্য দেশের ঝামেলায় তোমাদের না জড়ানোই ভাল। একটা কথা তোমাদেরকে পরিষ্কার বুঝতে হবে, এখানে যা ঘটছে, সে-ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা সত্যি অসহায়...’

বসকে থামিয়ে দিল মোহনা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, ‘এতই যখন অক্ষম ও অসহায় বোধ করছেন, আপনি পদত্যাগ করছেন না কেন, সার? কেন এমন কারও হাতে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন না, যিনি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে আমাদেরকে কাজে লাগাতে পারবেন? যিনি আমাকে অধিকার দিতে পারবেন কায়েস হত্যার প্রতিশোধ নিতে?’

শ্রাগ করলেন টিসিআই প্রধান। ‘সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু সেটাই কি সমাধান? আমি পদত্যাগ করলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? হবে না। যিনি আসবেন তিনিও নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। তা ছাড়া, মোহনা, কায়েসের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানের তরফ

থেকে আমরা ওর কেসটাকে অতটা গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারি না যে...'

'আমি তার সন্তান বহন করছি, সার,' বলল মোহনা, এবার নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল, তার দু'গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'আমার সন্তানের বাবাকে যারা খুন করল, আমার দেশ তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না?'

হকচকিয়ে গেলেন বস্। ধীরে ধীরে মাথা নত করলেন। চেম্বারের উপস্থিত সবাই যেন দম ফেলতেও ভুলে গেছে।

এক সময় টিসিআই চিফ-এর কানে ফিসফিস করে কিছু বলল সত্যশুভ চুনাভান।

জবাবে মাথা ঝাঁকালেন টিসিআই চিফ, নীরবতা ভেঙে বললেন, 'মোহনা, তোমার যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পূরণ করা আমাদের সাধ্যের অতীত। আমি শুধু নিজের অক্ষমতা আর আমার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু সবার মত তোমার প্রতিও আমার নির্দেশ – চোখ-কান বুজেই থাকতে হবে, কোনও অ্যাকশনে যেতে পারবে না, কারণ নীতি-নির্ধারকরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তাতেই দেশের মঙ্গল।

'আমার আর কিছু বলার নেই। কার কোথায় কী ডিউটি, চুনাভানের কাছ থেকে জেনে নেবে তোমরা। কাল থেকে আমি ছুটিতে যাচ্ছি।'

সবাইকে বিদায় করে দিয়ে উত্তরা ও মোহনাকে নিয়ে কনফারেন্স রুমে চলে এল চুনাভান। দীর্ঘ আলাপের পর স্থির হলো থাই থান্ডার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে ওরা দুজন। সেই সঙ্গে জানবার চেষ্টা করবে বিসিআই কাদেরকে পাঠাচ্ছে, কোথায় গিয়ে কী করতে চাইছে তারা ইত্যাদি।

দুজনে যা জানবে, সরাসরি সত্যশুভ চুনাভানের কাছে রিপোর্ট করবে তারা।

'মোহনা?' রানার প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলল উত্তরা। 'ইমরুল কায়েসের সঙ্গে তার বিয়ে হতে যাচ্ছিল। মাস ছয়-সাত পর ওর একটা বাচ্চা হবে।'

'ইয়াল্লা!' বিড়বিড় করল রানা। 'আপনি জানেন কোথায় পাব তাকে?'

'ঠিক জানি না, তাকে সম্ভবত সিঙ্গাপুরে যেতে হয়েছে...' বলল উত্তরা। একটু পর আবার বলল, 'আপনাকেও তো ওখানে যেতে হবে।'

'মানে?' একদিকের ভ্রূ সামান্য একটু কপালে তুলল রানা, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'আমাকে সিঙ্গাপুরে যেতে হবে কেন?'

'কী আশ্চর্য, আপনিই না তখন বলছিলেন যে থাই থান্ডারকে খুঁজছেন!'

'হ্যাঁ, খুঁজছি তো।'

'থাই থান্ডার এই মুহূর্তে সিঙ্গাপুরে খুব ব্যস্ত। ওদের লিডার চক্রি চুয়ানের নাম শুনেছেন?' জিজ্ঞেস করল উত্তরা। 'তাকেও ওখানে পাবেন।'

'সিঙ্গাপুরের ঠিক কোথায় পাঠাচ্ছেন আপনি আমাকে?' জানতে চাইল রানা। 'সেখানে আমার জন্যে ঠিক কী ধরনের ফাঁদ পাতা থাকবে?'

হেসে উঠল উত্তরা, বলল, 'যদি সন্দেহও করেন যে আমি আপনার প্রতিপক্ষ, এবং আপনাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে চক্রি চুয়ানের আস্তানায় পাঠাচ্ছি, তাও আপনি সেখানে একবার ঢু মারতে যাবেন।'

'অর্থাৎ এসপিওনাজ আপনি খুব ভালই বোঝেন,' মন্তব্য করল রানা।

'নো কমেন্ট,' বলল উত্তরা। 'ফাঁদটার ঠিকানা মুখস্থ করে নিন। ক্যাসিনোর নাম, বিগ ডিল। ওটা আয়ার রাজা রোডে, মালিক চক্রি চুয়ান।'

নিজের অজান্তেই বাম কবজিতে পরা ব্রেসলেটের উপর চোখ চলে গেল রানার। 'ভাগ্যটা দেখছি সত্যি ভাল, তথ্যের একটা অফুরন্ত উৎস পেয়ে গেছি।'

'সিঙ্গাপুরে থাই থান্ডারের বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সেফহাউস থাকলেও, ওখানকার পুলিশের ভয়ে খুব সাবধানে চলাফেরা করে ওরা। আমি বলতে চাইছি, ওখানে ওরা খুব বেশি স্পর্শকাতর, কাজেই সাবধান।'

'এখনও কি ওদের লিডার বুকরিত প্রেমজ? নাকি নতুন কেউ এসেছে?' জানতে চাইল রানা।

'সাধারণত বস্ খুন না হলে নেতৃত্ব বদল হয় না,' বলল উত্তরা। 'এবারও তাই হত, তবে প্রেমজ অত্যন্ত চালাক লোক বলে হয়নি। তাকে কে খুন করবে, আগেভাগে বুঝে ফেলে সে, তাই তার হাতে দলের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে গেছে।'

'কাকে সে তার সম্ভাব্য খুনি বলে সন্দেহ করেছিল?'

'কাকে আবার, চক্রি চুয়ানকে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, উত্তরা।'

'মিস্টার মাসুদ রানা, এবার আপনাকে যেতে হয়,' বলল উত্তরা। 'কারণ সূর্যটা ডুবে গেলে অন্ধকারে আপনাকে একা ছাড়তে আমার বিবেকে বাধবে। অথচ এখানে আপনার থাকাও চলে না। কাল সকালে প্রজারা এসে যদি দেখে...'

হাত তুলে দেখাল রানা। 'এখানে খড়ের কোনও অভাব নেই, আমাকে লুকিয়ে রাখতে আপনার কোনও সমস্যা হবে না। তা ছাড়া আমরা তো চারদেয়ালের ভেতর রয়েছি, কী করে বুঝছেন সূর্য ডুবে যায়নি?'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল উত্তরা। 'ওহ্, ইউ আর ইমপসিবল!'

সাত

পরদিন

ব্যাংকক। হোটেল শেরাটন ইন্টারন্যাশনাল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে রাত দুটোয় রওনা হলো রানা। সঙ্গে লাবণী রয়েছে, নোনথাবুরি নদীবন্দরে যাবে ওরা।

পৌঁছাতে এক ঘণ্টা সময় লাগল। সমুদ্রবন্দর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে জায়গাটা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সরু কয়েকটা সাইড রোড ধরে এল ওরা। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে তার কাছাকাছি, বন্ধ একটা ওয়্যারহাউসের পাশে ঘাপটি মেরে বসে থাকল। কাত করে রাখা কয়েকটা খালি ড্রাম ওদেরকে আড়াল দিচ্ছে, সেখান থেকে অন্ধকারে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। দুজনেই ওরা সশস্ত্র।

বেশ কজন লোক, অলস পিঁপড়ের মত একা একা কার্গো শিপে মাল ভরছে। কাছাকাছি আরেকটা ওয়্যারহাউসের ভিতরে সম্ভবত বেযমেন্ট আছে, কুলিরা প্রত্যেকে সেখান থেকে একটা করে কাঠের বাক্স তুলে আনছে। ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে ডক পেরুচ্ছে তারা, তারপর গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পার হয়ে উঠে যাচ্ছে কার্গো শিপে। ওয়্যারহাউসের চারপাশ ফ্লাডলাইটের আলোয় দিনের মত আলোকিত, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কও তাই। মাঝখানটা অন্ধকারের কালো চাদরে মোড়া।

কুলিরা প্রায় সবাই বিদেশি, মাত্র এক কি দুজন চিনা। থাই নেই একজনও। সব মিলিয়ে বিশ-বাইশজন হবে তারা। কারও মধ্যেই খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই। চিনারা ওয়্যারহাউসের গেটে

দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, প্রত্যেকের হাতে কারবাইন। রানা ভাবল, উত্তরার কথা সত্যি হলে, এই নোনথাবুরি থাই টং-এর লিজ নেওয়া বন্দর। আর টং মানেই চিনাদের কারবার। কাজেই এখানে চিনারাই তো পাহারায় থাকবে।

রানা লক্ষ করল, কাঠের বাক্সগুলো বিভিন্ন আকৃতির। দু'একটা বাক্সের ঢাকনি খুলে গেছে, ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে শাক কিংবা সবজি। ব্যাংকক থেকে পাঁচশো মাইল দূরের দুর্গে শিপে করে তাজা তরি-তরকারি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোনও পাগলেও এটা বিশ্বাস করবে না।

রানা ভাবছে, জিকো তানাই থাই টং-এর চিফ। সে এখন ব্যান সপ দুর্গে আছে। তার সহকারী চাই-পাই দেও। কোথায় সেই দেও? তার না নোনথাবুরি নদী বন্দরে কার্গো তোলা তদারকি করবার কথা?

কী করা যায় ভাবছে রানা।

'মাসুদ ভাই,' হঠাৎ ওর কানের কাছে ফিসফিস করল লাবণী। 'গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনও পথে জাহাজটায় চড়া যায়?'

সামনের দিকে ঝোঁকার জন্য হাঁটুর উপর কনুই ঠেকাল রানা। 'তা হয়তো যায়। কিন্তু এই কার্গো শিপ যে ব্যান সপ দুর্গে যাচ্ছে, তার নিশ্চয়তা কী?'

এই সময় ওয়্যারহাউসের চিনা গার্ডদেরকে সচকিত হয়ে উঠতে দেখল ওরা। কাঁধ থেকে কারবাইন নামিয়ে হাতে নিল তারা, অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল, তারপর ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে আসা এক লোককে একযোগে ঠকাস করে স্যালুট করল।

লোকটা দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ হলুদ, চোখ দুটো এত ছোট যে সরু দাগের মত লাগে। সাদা সুট পরে আছে, বুকের কাছে বাটনহোলে লাল গোলাপ আটকানো। হাতে একটা চুরুট।

'বেযমেন্ট খালি হতে আরও চল্লিশ মিনিট লাগবে,' চিনা ভাষায় বলল লোকটা। 'আমি শিপে উঠছি, কাজটা শেষ হলে

আমাকে রিপোর্ট করবে।'

'ইয়েস, সার, মিস্টার চাই-পাই দেও!' গার্ডদের লিডার আরেকবার স্যালুট করল।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে এগোল দেও। এক মিনিটের জন্য অন্ধকার গ্রাস করল তাকে। রানার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে লোকটার উপর, ছুরির হাতল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেয় হৃৎপিণ্ডে। অবাস্তব চিন্তা, জানে ও। কুলিরা দুই সারিতে আসা-যাওয়া করছে, গার্ডরাও তাকিয়ে আছে তাদের কর্মকর্তার দিকে, বোকার মত কিছু করতে গেলে স্রেফ ধরা খেয়ে মারা পড়তে হবে।

'শুনলেন, মাসুদ ভাই?' আবার ফিসফিস করল লাবণী।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জাহাজটা ব্যান সপে যাক বা না যাক, ওটায় চড়তে হবে আমাদের।'

'সেক্ষেত্রে, আমাদেরকেও কুলি হতে হবে।'

মাথা ঝাকাল রানা। লক্ষ করল, লোকগুলো আসা-যাওয়া করছে সময়ের একটা ফাঁক রেখে। সেটা এক মিনিটের কিছু বেশি হবে তো কম নয়।

প্রত্যেকেই তারা নিজের মাথায় একটা করে ভাঁজ করা গামছা রেখেছে, শক্ত বাক্সের চাপ থেকে খুলিটাকে রক্ষা করবার জন্য। সবার পরনে একই পোশাক – এক রঙা পুরানো ফতুয়া, জিনস ও জুতো। মাথায় বাক্স নিয়ে ডক ধরে হাঁটবার সময় গতি মন্থর, জাহাজ থেকে নেমে ওয়্যারহাউসের দিকে ফেরার সময় প্রায় ছুটছে।

ওদের দুজনকে কাবু করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। কাজটা করতে হবে যখন ওরা জাহাজ থেকে খালি মাথায় ফিরতি পথে থাকবে। টার্গেট করতে হবে একজন ছোট আর একজন বড় সাইজের কুলিকে।

ওরা নিজেরাও জিনস পরে আছে, কিন্তু কুলিদের জিনস

পুরানো ও ছেঁড়া, কাজেই ওগুলো বদলাতে হবে। আর দরকার ফতুয়া ও চামড়ার পুরানো জুতো, জিনসের মত এগুলোও ছোট-বড় হতে হবে। এবং কোথাও কোনও রক্ত লাগা চলবে না।

নিজের ওয়ালথারটা বের করে উল্টো করে ধরল রানা। লাবণীর হাতেও তার ছোট্ট পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' ফিসফিস করল রানা। 'কাভার দাও আমাকে।'

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে নেমে ওয়্যারহাউসের দিকে এগিয়ে আসছে একজন কুলি। অন্ধকার ডকে আরেক কুলিকে পাশ কাটাল সে। কিছুক্ষণের বিরতি। মাথায় ছোট একটা বাক্স নিয়ে লোকটাকে আবার ফিরে আসতে দেখল রানা, হাত দুটো মাথার উপর তুলে বাক্সটা ধরে আছে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে উঠতে শুরু করল সে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের মাথায় এক লোক পাশ কাটাল তাকে, ঢাল বেয়ে নীচে নেমে আসছে। ছোটখাট কাঠামো, লাবণীর চেয়ে সামান্যই বড় হবে। এর পরিচ্ছদ দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। লাবণীর কাঁধটা একবার ছুঁয়ে সরে গেল রানা।

অন্ধকার থেকে না বেরিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে রানা, কুঁজো হয়ে আছে পিঠটা। আলো থেকে অন্ধকারে ঢুকল লোকটা, মাথায় বোঝা না থাকায় হনহন করে হাঁটছে। অন্ধকারে ঢুকে পাঁচ পা মাত্র এগিয়েছে সে, এই সময় তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল রানা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে গায়ের জোরে তার কপালে মারল ও।

এক আঘাতেই চোখ উল্টে গেল লোকটার। মাথা থেকে বাক্সটা পড়ে যাচ্ছে দেখে খপ করে ধরে ফেলল রানা। ওর পাশে প্রায় নিঃশব্দে ঢলে পড়ল অজ্ঞান লোকটা।

বাক্সটা মাথায় তুলল রানা, তারপর একটা হাত ধরে লোকটাকে টেনে আনল ড্রামের আড়ালে।

এরইমধ্যে নিজের শার্ট ও জিনস খুলে ফেলেছে লাবণী। লোকটার গা থেকে এক এক করে সব খুলছে ও, পাশে বসে

আলো-আঁধারির উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। এবার বড়সড় একজন কুলি দরকার, ওর কাঠামোর সঙ্গে যতটা বেশি মেলে। ইতিমধ্যে দুজনকে দেখেছে, যাদেরকে দিয়ে কাজ চালানো যাবে। একজন জাহাজে উঠেছে, আরেকজন ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে। দুজনেই তারা চিনা।

রানা তাকিয়ে আছে, আরও দুজন ছোট আকৃতির লোক হেঁটে গেল। ইতিমধ্যে অজ্ঞান লোকটার পরিচ্ছদ খুলে পরে নিয়েছে লাবণী। হোলস্টার সহ নিজের বেল্টটাও জড়িয়েছে কোমরে। ওই বেল্টের সঙ্গে জোড়া লাগানো দুটো খাপে ছুরি ও বিনকিউলারও লুকানো আছে। সব চুল মাথার মাঝখানে জড়ো করে ভাঁজ করা গামছা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে বলে একহারা একটা কিশোর ছেলের মত লাগছে ওকে।

রানার বাছাই করা লোক দুজনের একজন গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে নেমে আসছে। ঢালে আরেক লোককে পাশ কাটাল সে, মাথায় বাক্স নিয়ে উপরে উঠছে। আবার এগোল রানা। প্রথমে যেমন আন্দাজ করেছিল ও, আকারে তার চেয়ে বড় লোকটা। অন্ধকারে ঢুকে আগের লোকটার চেয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করবার প্রস্তুতি নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রানা।

নিশ্চয়ই ষষ্ঠইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিয়েছে, অকস্মাৎ ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল চিনা লোকটা, ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল পিছনদিকে। টার্গেট ঠিক থাকল না, ফলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল রানা। ওয়ালথারের বাঁট আঘাত করল লোকটার ঘাড়ে।

ছুটে আসছিল রানা, গতির সেই ঝোঁককে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। লোকটাকে পাশ কাটাচ্ছে ও, বাম হাত দিয়ে খপ করে তার শার্ট খামচে ধরল। ঠিক তখনই প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল লোকটা ওর পেটে।

চোখে সরষে ফুল দেখছে, তারপরও লোকটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য শার্টটা ধরে টানাটানি করছে রানা। ঠিকই ভারসাম্য

হারাল সে, আর সেই সুযোগে তার গলায় হাত দিল ও। লোহার মত শক্ত শরীর লোকটার, অত্যন্ত শক্তিশালী। এ লোক চেঁচাবে না। তার ধারণা, যে-ই লাগতে আসুক, সাইজ করে দেবে তাকে।

লোকটার পিছনে রয়েছে রানা। বাম হাতে ওর গলা আঁকড়ে ধরেছে। পিছনদিকে কনুই চালাল চিনা। সেটা এড়াবার জন্য শরীরটাকে সিকি পাক ঘুরিয়ে নিল রানা। দুজনেই ওরা নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করছে। দু-জোড়া জুতোও ডকে ঘষা খেয়ে কর্কশ শব্দ তৈরি করছে।

শরীরটাকে মুচড়ে রানার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল লোকটা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর পাঁজরে বাড়ি মারল রানা। লোকটা বোধহয় কিছু অনুভবই করল না। এরপর ওর মাথার পিছনে মারল রানা। এবার সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকল চিনা।

রানার হাত ধরল, টান দিয়ে নিজের গলা থেকে ওটাকে নামাতে চাইছে। তারপর সামনের দিকে ঢলে পড়তে শুরু করল সে, রানাকে টানছে, ওর পা দুটো যাতে শূন্যে উঠে যায়।

আড়ষ্ট হলো রানা, পা দুটোকে সামান্য ফাঁক করে নিল। লোকটার গলাকে ছাড়িয়ে কাঁধে গিয়ে পৌঁছাল ওর বাম হাত, কণ্ঠনালীতে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। লোকটা তার গোড়ালি ঠুকে ওর পায়ের পাতা থেঁতলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল বারকয়েক। রানা ওর হাতের পেশি যতটা সম্ভব শক্ত করে উইন্ডপাইপে চাপ বাড়িয়েই যাচ্ছে। চিনা প্রতিপক্ষ ওর হাত খামচে ধরেছে। এবার পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথার পিছনে আরও দুবার আঘাত করল রানা।

এতক্ষণে লোকটার পেশিতে ঢিল পড়তে শুরু করল। আবার আঘাত করল রানা। হাত দুটোর উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকল না। বড়শিতে ঝুলে থাকা মাছের মত ঝাঁকি খাচ্ছে এখন। গলাটায় চাপ আরও বাড়াল রানা। হাত দুটো শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল চিনা দৈত্যের। ঢলে পড়ল মাটিতে।

ঝুঁকে তাকে সিধে করল রানা, তারপর দু'হাতে ধরে তুলে নিল কাঁধে। ঘুরতে যাচ্ছে, এই সময় গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে আরেক চিনাকে নেমে আসতে দেখল। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা।

আড়ষ্ট একটা মুহূর্ত, জমে গিয়ে দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা দশ ফুট দূরে, লাফ দেওয়ার জন্য ব্যবধানটা খুব বেশি হয়ে যায়; আর রানার কাঁধে রয়েছে ভারী বোঝা। আকস্মিক বিস্ময়ের শিকার লোকটা। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। কেউ তার মুখের ভিতর আস্ত আপেল ভরে দেবে, হাঁ করে থাকার ভঙ্গি সেরকমই। হঠাৎ শ্বাস নিতে শুরু করায় তার বুক চওড়া হচ্ছে।

এত দ্রুত গতি, দৃষ্টি দিয়ে কোনও রকমে অনুসরণ করতে পারল রানা। অন্ধকার থেকে স্যাৎ করে বেরিয়ে এল সরু একটা হাত, সশব্দে চাপা দিল খোলা মুখ। একটা ছুরির ফলা ঝিক করে উঠল অন্ধকারে। পিঠ বাঁকা করল লোকটা, চোখ দুটো আরও খুলে গেল। সেই চোখ থেকে প্রাণের সমস্ত লক্ষণ নিঃশেষে মুছে যেতে দেখছে রানা। সামনের দিকে ঝুঁকল সে, ডকে হাঁটু গাড়ল। একটা হাত খামচে ধরে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লাবণী, রানাকে পাশ কাটিয়ে ড্রামগুলোর দিকে এগোচ্ছে।

তার পিছু নিয়ে ওখানে পৌঁছেই কাঁধ থেকে বোঝাটা নামাল রানা, দ্রুত হাতে এক এক করে তার পরিচ্ছদ খুলে নিচ্ছে। লাশটার পরনের কাপড়ে ছুরির ফলা মুছল লাবণী, তারপর ওটা নিজের বগলের কাছে বাহুতে বাঁধা খাপের ভিতর রেখে দিল। চারপাশে নজর রাখছে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

বুট ছাড়া বাকি সবই ফিট করল। ওগুলো একটু ঢিলে লাগছে। কুলির পরিচ্ছদ পরা শেষ করে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে লাবণীর পাশে চলে এল রানা। 'আমি ওয়্যারহাউসে যাচ্ছি,' বলল ও, পিস্তলের দুটো এক্সট্রা ক্লিপ ভরল নোংরা

জিনসের পকেটে। ‘ত্রিশ সেকেন্ড পর পিছু নেবে তুমি।’

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল লাবণী। রওনা হলো রানা, কাঁধে হাত পড়ায় স্থির হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে লাবণীর দিকে তাকাল ও।

দু-হাতে ধরে ওকে নিজের দিকে ফিরাল লাবণী। তার ঠোঁটের কোমলতা স্পর্শ করল রানার ঠোঁট। দীর্ঘ এক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর রওনা হয়ে গেল রানা।

মাথার মাঝখানে ভাঁজ করে বসানো গামছাটার দু’প্রান্ত মুখের দু’পাশে খানিকটা করে ঝুলিয়ে দিয়েছে রানা, চেহারাটা যাতে কিছুটা ঢাকা পড়ে। ওয়্যারহাউসের সামনে ফ্লাডলাইটের তৈরি আলোর বৃত্তে পা রাখল ও। গার্ডরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। মাথায় বাক্স নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে এক লোক। একবারও না তাকিয়ে রানাকে পাশ কাটাল সে। রানা আশা করল, রওনা হওয়ার আগে লোকটাকে পাশ কাটাতে দেবে লাবণী। খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও।

আরেকটু হলে দেরি করে ফেলত ওরা। বেযমেন্টে আর মাত্র নয়টা বাক্স পড়ে আছে। ধাপ বেয়ে গুহার মত বড় একটা কামরায় নেমে এসেছে রানা। দরজার কাছে চেয়ারে বসে রয়েছে এক টেকো চিনা, হাতে ক্লিপবোর্ড। প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে ফোনে: ‘স্পেশাল ইঞ্জিন ফিট করা আছে, সার। পনেরো ঘণ্টার বেশি লাগবে না।’

তাকে পাশ কাটিয়ে বাক্সগুলোর দিকে এগোল রানা, শুনতে পেল রিসিভারে এখনও কথা বলছে সে: ‘...ইয়েস, মিস্টার জিকো...জী, দুটো মেসেজ পেয়েছি আমি...জী, তাইওয়ানিজ টং লিডার মো পাই কপ্টার নিয়ে রওনা হবেন... জী... আর ওদিক থেকে নেগোশিয়েশনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কাউকেই পাঠানো হবে... না, চক্রি চুয়ান নিজে যাবেন না,

থাইল্যান্ডে নেই তিনি...হতে পারে, তাঁর বান্ধবীকে পাঠাতে পারেন...জী, তার অপেক্ষায় আমরা রওনা হতে এক ঘণ্টা দেরি করব।'

মাথায় বড় একটা বাক্স তুলল রানা। মাথাটা গামছার প্রান্ত দিয়ে ঢেকে উঠে আসছে বেযমেন্ট থেকে। ওর দিকে একবারও তাকায়নি লোকটা।

আকারে বড় হলেও, বাক্সটা তেমন ভারী নয়। ধীরে ধীরে ওয়্যারহাউসে উঠেছে রানা, অথচ লাবণীকে দেখতে পাচ্ছে না। সশস্ত্র গার্ডদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল ফ্লাড লাইটের আলোয়, এতক্ষণে দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে লাবণী।

হাঁটার গতি কমাল রানা। ওকে পাশ কাটাল লাবণী, মুখ গামছা দিয়ে কিছুটা ঢাকা। সামনে তাকাতে আরেক লোককে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে নামতে দেখল রানা।

কয়েকটা ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছে ও। দেখে এসেছে ছোট বাক্সগুলো বেশি ভারী, জানা না থাকায় একটা ছোট বাক্সই মাথায় তুলবে লাবণী। তোলার সময় কষ্ট পাচ্ছে দেখলে চেয়ারে বসা লোকটার মনে সন্দেহ জাগবে। রানা লক্ষ করেছে, ওখানে আর মাত্র তিনটে ছোট বাক্স আছে।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে নেমে আসা লোকটা পাশ কাটাচ্ছে রানাকে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও। ভয়ে শীত শীত লাগছে ওর। এই লোকটা যদি লাবণীর মুখ দেখতে পায়...

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল ওয়্যারহাউস থেকে আলোর বৃত্তে বেরিয়ে আসছে লাবণী। ঠিক ঢোকার সময় তাকে পাশ কাটাল লোকটা, কেউ কারও দিকে তাকাল না। মাথায় ছোট বাক্সই নিয়েছে লাবণী, বয়ে আনতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হলো না।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে আবার উঠতে শুরু করল রানা।

বাক্সগুলো কোথায় যাচ্ছে জেনে নিতে কোনও সমস্যা হলো

না। ট্রেইলে প্রচুর সূত্র ছড়িয়ে আছে – সবজির টুকরো ও খড়। জাহাজের বাম দিকে চলে গেছে ট্রেইলটা। সেটার পিছু নিয়ে একটা হ্যাচওয়েতে পৌঁছাল রানা, ধাপ বেয়ে নীচে নামবার সময় ভাবল, এই হোল্ডের ভিতরে চব্বিশ ঘণ্টা আটকা থাকতে হবে?

চব্বিশ ঘণ্টায় কত দূর যাবে এই কার্গো শিপ? স্পেশাল ইঞ্জিন খুব বেশি হলে ঘণ্টায় পঁচিশ নট স্পিড তুলবে। চব্বিশ ঘণ্টায় কমবেশি পাঁচশো কিলোমিটার যেতে পারবে।

তার মানে কি ব্যান সপ দুর্গে যাচ্ছে দেও?

ধাপ বেয়ে নামছে রানা, খালি হাতে এক লোককে উঠে আসতে দেখল। থেমে ওকে পাশ কাটাবার জায়গা ছেড়ে দিল সে। তবে পরস্পরের দিকে তাকাল না কেউ। বাঁক ঘুরে মইটা নেমে গেছে একটা চেম্বারে। কাঠের বাক্সে প্রায় ভরে গেছে জায়গাটা। ভিতরে এই মুহূর্তে রানা ছাড়া আর কেউ নেই।

মাথার বাক্সটা ডেকে নামিয়ে রেখে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। বাক্সগুলো মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত কয়েক সেকশনে ভাগ করে সাজানো হয়েছে। এরইমধ্যে দুটো সেকশন মোটা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। ওরা যে বাক্সগুলো নিয়ে আসছে সেগুলো দিয়ে তৈরি হবে তৃতীয় ও শেষ সেকশন। রানা চিন্তা করল, সেকশনগুলোর মাঝখানে শেষ পর্যন্ত খালি কোনও জায়গা থাকবে তো?

পা চালিয়ে দু'নম্বর সেকশনের সামনে চলে এল রানা, ব্যস্ত হাতে ওটাকে বেঁধে রাখা একটা লাইন খুলে ফেলল। বাক্স বেয়ে সেকশনটার মাথায় চড়ল, উপরের একটা বাক্স খানিকটা টেনে এনে উঁকি দিয়ে দেখল কী আছে পিছনে।

পিছনে আরেক সারি বাক্স। ওই সারির উপরের বাক্সটাও খানিক টানল রানা। ওটার পিছনে ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল – ছ'ফুট চওড়া, দৈর্ঘ্যে চেম্বারের সমান। বাক্সগুলো সরানো অবস্থায় রেখে নীচে নেমে এল ও।

নীচে নেমে লাইনটা আবার বাঁধল রানা, তবে যে বাক্স দুটো সরিয়েছে সেগুলো বাদে। লাইনটা টান টান করে বাঁধার কাজ শেষ করেছে, এই সময় পায়ের আওয়াজ ভেসে এল মইয়ের ধাপ থেকে। ঝুঁকে নিজের বাক্সটা আঁকড়ে ধরল রানা, যেন এইমাত্র ওটাকে নামিয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এল লাবণী। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মাথা থেকে বাক্সটা নামাতে সাহায্য করল রানা।

'কেউ কিছু সন্দেহ করেনি তো?'

এত হাঁপিয়ে গেছে, কথা বলতে পারছে না লাবণী, শুধু মাথা নাড়ল। পিঠে একটা হাত রেখে তাকে কাছে টেনে নিল রানা। একহারা শরীরটা গরম হয়ে আছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে সে, তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। তারপর তার চিবুকটা উঁচু করল, মুখটা যাতে দেখতে পায়।

'আর মাত্র একটা কাজ বাকি,' বলল রানা। 'তারপর সারাটা পথ আমরা বিশ্রাম নিতে পারব।'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে ছেড়ে একটু সরে গেল লাবণী।

উপরের একটা মই থেকে পায়ের ভারী আওয়াজ ভেসে আসছে। সমানে টেনে আনা বাক্স দুটোর দিকে দ্রুত উঠে যাচ্ছে রানা। খানিকটা উঠে একটা হাত লম্বা করল নীচের দিকে, সেটা শক্ত করে ধরে ওর সঙ্গে লাবণীও উঠছে। বাক্সগুলো আরও খানিক টেনে আনল ও, লাবণী যাতে ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকতে পারে।

মাথাটা আগে ঢোকাল লাবণী। অপরদিকে পৌঁছে একপাশে হাত বাড়াল, একটা বাক্স আঁকড়ে ধরে টেনে নিল পা দুটো, তারপর নীচের দিকে নামিয়ে দিল সেগুলো। বাক্স বেয়ে মেঝের দিকে নেমে যাচ্ছে।

ভারী পায়ের শব্দ এখন ভেসে আসছে দ্বিতীয় মইয়ের ধাপ থেকে।

ভিতরে ঢুকল রানা, পিছনের আলগা বাক্সগুলো টেনে আনল জায়গা মত। তারপর বাক্সের দেয়াল বেয়ে নেমে এল মেঝেতে, লাবণী যেখানে শুয়ে আছে।

জুতোর আওয়াজ চেম্বারের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বাক্সের গায়ে ঘষা খেল আরেকটা বাক্স। জুতোর আওয়াজ উঠে গেল মই বেয়ে।

লাবণী শুয়ে আছে ভ্রূণের আকৃতি নিয়ে। তার পাশে লম্বা হলো রানা। এক মুহূর্ত পর অনুভব করল লাবণী ওর বুকে মাথা রাখছে।

ইতিমধ্যে তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে গভীর হলো সেটা। ঘুমিয়ে পড়ল অচিরেই।

খড়গুলো শুকনো ও গরম। অন্য কোনও উপায় নেই, জাহাজ যতক্ষণ না গন্তব্যে পৌঁছায় ততক্ষণ এখানেই থাকতে হবে ওদেরকে। কান পেতে অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কোনও কাজও নেই। ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট পেতে হবে, জানে, তবে সেটাকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না রানা। ভাবছে গন্তব্যে পৌঁছে প্রথমেই যদি দেওটাকে মারা যায়, প্রতিশোধ নেওয়ার কাজটা শুরু হয়ে যায় তা হলে।

আট

লাবণী ঘুমাচ্ছে। ইস্পাতের বাল্কহেডে হেলান দিয়ে রানা শুনতে পেল শেষ সেকশনটা রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধার সময় কয়েকজন লোক ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। মই বেয়ে উঠে গেল তারা, উপর থেকে ভেসে এল হ্যাচ বন্ধ করবার কর্কশ ধাতব আওয়াজ।

এক ঘণ্টা নয়, মাত্র ত্রিশ মিনিট পর কেঁপে উঠল কার্গো শিপ। রানা ভাবল, তারমানে থাই টং বস জিকো তানাইয়ের সঙ্গে নেগোশিয়েশনের জন্য কেউ একজন উঠেছে জাহাজে। কীসের নেগোশিয়েশন, কার স্ত্রী, কিছুই জানা নেই ওর। তবে মনে পড়ল, উত্তরা কথায় কথায় বলেছিল যে থাই থান্ডারের সঙ্গে থাই টঙের কী নিয়ে যেন একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সেটাই বোধহয় মিটমাট করবার চেষ্টা চলছে।

আওয়াজ শুনে বোঝা গেল অত্যন্ত শক্তিশালী ইঞ্জিন। রওনা হয়ে গেল ওরা। শেষ রাতের নদীপথ ফাঁকা হওয়ারই কথা। রানা আন্দাজ করল, কার্গো শিপের স্পিড ঘণ্টায় পঁচিশ নট-এর কম নয়। দুই হাজার বিশ গজে এক নট। এই স্পিডে চললে কমবেশি পনের ঘণ্টার মধ্যে ব্যান সপ দুর্গে পৌঁছে যাবে ওরা, ওটাই যদি কার্গো শিপের গন্তব্য হয়ে থাকে।

ভোর ছ'টার দিকে জাহাজের দোলায় ঘুম চলে এল রানার চোখে। পাশ থেকে মৃদু শব্দ করল লাবণী। ওর বুকে তার চোখের পাতা নড়েচড়ে উঠল।

'মাসুদ ভাই?' খসখসে গলায় ডাকল সে, কিছুটা ঘুমে জড়ানো।

'উম্‌ম্‌?'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি আমি?'

'ঘণ্টা দুয়েক। ঘুমটা তোমার দরকার ছিল।'

'তুমি ঠিক জানো, কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'সম্ভবত টং লিডারের হেডকোয়ার্টার ব্যান সপ দুর্গে,' বলল

রানা।’

‘ওখানে আমরা প্লেনটা খুঁজব,’ বলল লাবণী, তারপর জানতে চাইল, ‘আর?’

‘সম্ভব হলে থাই টং চিফ জিকো তানাই ও তার সহকারী চাই-পাই দেও-এর একটা ব্যবস্থাও করতে হবে,’ বলল রানা।

‘বসকে তুমি কথা দিয়েছ,’ মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল লাবণী।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আবার ডাকল লাবণী। ‘মাসুদ ভাই।’

‘উম্‌ম্‌?’

‘ঘুমাচ্ছ?’

‘না।’

‘একটা কথা।’

‘বলো।’

‘তখন...তোমাকে আমি...চুমো খেলাম...আমার আসলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না...’

‘মানুষ খুন করার পর এরকম অনেকেরই হয়, অদম্য ভাবাবেগ। এটা অস্বভাবিক কিছু নয়।’

‘না, তা হয়তো নয়,’ বলল লাবণী। ‘তবে তোমার সঙ্গে এরকম কিছু ঘটবে বলে কখনও ভাবিনি।’

‘নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে?’

সঙ্গে সঙ্গে নয়, প্রায় দশ সেকেন্ড পর জবাব দিল লাবণী, ‘না। নিজেকে আমার লোভী মনে হচ্ছে।’ তারপর ব্যগ্র ভঙ্গিতে নিজের ঠোঁট জোড়া রানার ঠোঁটের কাছে তুলল সে।

এরপর মেয়েটিকে কাছে টেনে না নিয়ে উপায় কী রানার।

ক্ষুৎ-পিপাসা নিয়ে রাত কাটানো কষ্টকর, অন্ধকার ও গুমোট পরিবেশও বিরাট সমস্যা, তবে ওদের জন্য নয়। পরস্পরকে

নিয়ে এত ব্যস্ত থাকল ওরা, এ-সব কেউ খেয়ালই করেনি। দুজনেই সক্ষম ও শক্তিশালী, পরস্পরকে আনন্দে ভাসিয়ে দিতে কার্পণ্য করল না এতটুকু।

বিরতির সময় নিচু গলায় গল্প করল ওরা।

এক সময় প্রসঙ্গটা রানাই তুলল। 'ভাবছি এই সম্পর্কটা কোথায় নিয়ে যাবে আমাদেরকে।'

'আসলে কোথাও না,' শান্ত সুরে বলল লাবণী। 'এ থেকে পারমানেন্ট কিছু পাওয়া যায় না কোনওদিন। আমাদের যা কাজ, সারাক্ষণ চলার মধ্যে থাকতে হয়। কোনও বাঁধন থাকবে না। থাকবে না কোনও পিছুটান। একটা থেকে লাফ দিয়ে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাবার পথে কোনও বাধা গ্রহণযোগ্য নয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই।'

'এই জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি আমরা,' তার সুরে সুর মিলিয়ে মন্তব্য করল রানা। 'কোনও কিছু আমাদেরকে বাধ্য করছে না। এই স্বাধীনতার মূল্য অনেক।'

তারপর এক সময় ওরা পরীক্ষা করল বাক্সগুলোয় কী আছে। লাইটার জ্বালল রানা, ঢাকনি খোলা একটা বাক্স থেকে শাক-সবজি বের করল। হাত ঢুকিয়ে দেখল ভিতরে মসৃণ কী যেন রয়েছে। জিনিসটা চৌকি আকৃতির। বের করার পর দেখা গেল চকচকে ইস্পাতের বাক্স ওটা, লম্বা ও চওড়ায় প্রায় দুই ফুট। চারদিকই বন্ধ, কীভাবে খুলতে হয় বোঝা যাচ্ছে না। বেশ ভারী বাক্সটা, দশ থেকে বারো কেজির কম নয়।

বাক্সটার কিনারা পরীক্ষা করে রানা বুঝল, ইস্পাতের পাত যেখানে জোড়া লেগেছে সেখানে নির্দিষ্ট ধরনের ধারাল কিছু দিয়ে চাড় না দিলে খুলবে না। তবে জোড়া লাগার জায়গায় নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকে নিশ্চিত হওয়া গেল বাক্সের ভিতরে কী আছে।

আফিম।

আরও কয়েকটা বাক্স পরীক্ষা করল ওরা। কয়েকটা বাক্সে শুধুই তরি-তরকারি কিংবা ফলপাকড় ভরা হয়েছে, সঙ্গে অন্য কিছু নেই। কিছু বাক্সে অত্যন্ত উন্নতমানের জটিল যন্ত্রপাতি রয়েছে। এগুলো ঠিক কী কাজে লাগে বলতে পারবে না রানা, তবে ধারণা করল ফিজিক্স, ন্যানো টেকনলজি, অ্যাটম ফিউজিং লেযার ও অ্যারোডাইনামিক্স ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে হলে এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট দরকার হতে পারে।

রানার মনে পড়ল, ওদের বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা ফিজিক্স, ন্যানো টেকনলজি ও অ্যাটম ফিউজিং লেযার নিয়েই পড়াশোনা করেছেন। ভাবল, উত্তরার ধারণা সত্যিও হতে পারে – কায়েসের প্লেনটাকে হয়তো ব্যান সপ দুর্গেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

আপাতত ওটাকে কায়েসের দেখা প্লেন বলেই মনে করতে হবে, ভাবল রানা; কারণ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ বলছেন, মহাচিনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া দুটো ঈগলেরই হিসাব আছে তাঁদের কাছে; একটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আরেকটা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে।

তা হলে, কঠিন প্রশ্ন দাঁড়ায়: দোই ইনথানন পাহাড়ের নীচে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের লোগো সহ যে প্লেনটা কায়েস দেখেছে সেটা কোত্থেকে এল?

উত্তরাও ওকে বলেছে যে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের একটা জেট প্লেন ওখানে ছিল, দোই ইনথানন থেকে তোলা ফটো দেখে নিশ্চিত হয়েছে সে।

সরেজমিনে তদন্ত ছাড়া রহস্যটা ভেদ করা যাবে না।

কোথাও একবার থামল না থাই টং-এর কার্গো শিপ, সমান গতিতে ছুটে চলেছে সেই ভোর রাত থেকে সারাটা দিন।

হাতঘড়ি দেখে বোঝা গেল বিকেল হতে আর বেশি বাকি নেই। ইতিমধ্যে দুজনেই দু'তিন ঘণ্টা করে ঘুমিয়ে নিলেও, আরেক দফা ঘুমাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।

রাত আটটার দিকে ঘুম ভাঙল ওদের। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা, মাথাটা কাত করে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে।

'মাসুদ ভাই, কী ব্যাপার – ' তারপর লাবণী খেয়াল করল। গড়িয়ে রানার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে সে।

যান্ত্রিক গুঞ্জন বদলে গেছে। ইঞ্জিনের গতি কমছে। কার্গো শিপের দোল খাওয়া কমে এল। ডকে ভিড়ছে ওরা।

'আমরা পৌঁছেছি,' বলল রানা। অনুভব করল সমস্ত চুল মাথার মাঝখানে জড়ো করে ভাঁজ করা গামছা দিয়ে ঢাকছে লাবণী।

'একই কৌশলে বেরুব তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ। জাহাজ থেকে নামার পর সারাক্ষণ আমার ওপর নজর রাখবে তুমি। আমাদের স্বাধীনতা দরকার। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভিড় থেকে সরে যেতে চেষ্টা করব আমি।'

দ্রুত যে যার কাপড় পরে নিল ওরা। আরও অলস হলো ইঞ্জিন, তারপর থেমে গেল। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক নামাবার শব্দ ভেসে এল। তারপর হ্যাচ সরাবার ধাতব আওয়াজ। মই বেয়ে নেমে আসছে কুলিরা।

তিন নম্বর সেকশনকে বেঁধে রাখা লাইন খুলে ফেলল তারা। বাক্সের গায়ে ঘষা খাচ্ছে বাক্স। ওগুলোর একটা মাথায় তুলে মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে একজন কুলি, মইয়ের ধাপে তার ভারী বুটের আওয়াজ কর্কশ শোনাচ্ছে। তার পিছু নিল একজন। তারপর আরেকজন। শেষ লোকটা মই বেয়ে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা।

'ওরা আবার বাক্স নিতে আসার আগে কিছুটা সময় আছে,' বলল রানা। বাক্স বেয়ে উপরে চড়ল ও, মাথার দিকের দুটো বাক্স একপাশে সরিয়ে পথ বের করল। উজ্জ্বল আলোয় পানি বেরিয়ে এল চোখে। লাবণীর দিকে হাত নামাল ও।

বাক্স বেয়ে ওর পাশে উঠে এল লাবণী, ফাঁক গলে অপরদিকে

চলে গেল, তারপর নেমে পড়ল মেঝেতে। তার পিছু নিল রানা। তিন নম্বর সেকশনের অর্ধেকটাই খালি হয়ে গেছে।

'বড় একটা বাক্স নাও,' লাবণীকে বলল রানা। 'ওগুলো হালকা।' তার মাথায় বাক্স তুলতে সাহায্য করল ও, তারপর গামছার প্রান্ত দুটো টেনে-টুনে যতটা পারা যায় মুখ ঢাকার কাজে লাগাল। 'আমাকে আগে থাকতে দাও।'

নিজেও একটা বড় বাক্স নিল রানা। মইয়ের দিকে পা বাড়িয়েছে, উপরের ধাপ থেকে জুতোর আওয়াজ ভেসে এল। মইয়ের বাঁকে লোকটাকে পাশ কাটাল ও। কেউ কারও দিকে তাকাল না। রানার ঠিক পিছনে রয়েছে লাবণী। মইয়ের মাথায় ওঠার আগে আরও দুজন কুলিকে পাশ কাটাল ওরা।

মেইন ডেকে পৌঁছে সরাসরি গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে এগোল রানা।

নদী এখানে যথেষ্ট চওড়া।

নীচের ডকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কয়েকটা এক টনী ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওগুলোতেই বাক্স তুলছে কুলিরা। ডকের পর ইঁট বিছানো রাস্তা, উঠে গেছে একটা ঢালের মাথায়, তারপর চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে। প্রচুর গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড় জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। তিনটে ফ্লাডলাইট জ্বললেও, ওগুলো থেকে খুব বেশি আলো আসছে না।

ডকে নেমে এসে প্রথম ট্রাকটার দিকে এগোল রানা, এরইমধ্যে অর্ধেক ভরে গেছে সেটা। ড্রাইভাররা যে যার ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডকের দিকে মুখ করে অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে ট্রাকগুলো। ছ'ফুট পিছনে লাবণীর পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে রানা।

ট্রাকটার পিছনে পৌঁছানোর মুহূর্তে মুখটা নদীর দিকে ঘুরিয়ে রাখল ও। ক্লিপবোর্ড হাতে লোকটা রানার ডান দিকে। আরেকজন লোক রয়েছে ট্রাকের উপর, বাক্সগুলো সাজিয়ে রাখছে

সে।

মাথার বাক্স ট্রাক বেডে নামিয়ে রাখল রানা, তারপর ঘুরে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে হাঁটা ধরল। ধীর পায়ে এগোচ্ছে, অপেক্ষা করছে লাবণীর জন্য। শুনতে পেল ট্রাক বেডে ঘষা খেল তার বাক্স।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। পা চালিয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে লাবণী। তার পিছনে ক্লিপবোর্ডে আরও দুটো বাক্স লোড হওয়ার কথা লিখে রাখছে লোকটা। ট্রাকের চিনা ড্রাইভার সিগারেটে টান দিচ্ছে, গল্প করছে সঙ্গী ড্রাইভারদের সঙ্গে।

আলোর বৃত্তটা ঠিক গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছায়নি। পিছনে লাবণীকে ছায়ার মত নিয়ে ওটার দিকে হাঁটার সময় আলো থেকে বেরিয়ে এল রানা। উল্টোদিক থেকে আসছে না কেউ।

মাথা নিচু করে বাম দিকে দৌড় দিল রানা। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে ছুটছে, ডকে যাতে জুতোর শব্দ খুব কম হয়।

এক সারি ঝোপের ভিতর ঢুকে মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো রানা। ওর পাশে নিচু হলো লাবণীও। তারপর দুজন একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

মাথায় বাক্স নিয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে নেমে আসছে এক লোক, ধীর পায়ে অপেক্ষারত ট্রাকের পিছনে পৌঁছাল। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা মুখ না তুলেই ক্লিপবোর্ডে টিক চিহ্ন দিল। পরিবেশ একেবারে শান্ত। না, কেউ ওদেরকে পালাতে দেখেনি। ঝোপের দিকে ফিরে এগোল রানা।

বিশ গজের মত হাঁটল ওরা। তারপর বৃত্ত তৈরি করে ডকের দিকে ফিরল। খুব সাবধানে, ধীর পায়ে হেঁটে এল ওরা, ঝোপ খসখস করছে দেখে কেউ যাতে গুলি না চালায়।

ওরা ফিরে এল ইঁট বিছানা রাস্তা যেখানে ডক ত্যাগ করেছে তার কাছাকাছি। দৃশ্যটায় নতুন একটা জিনিস যোগ

হয়েছে।

ট্রাকগুলোর সামনে বিরাট কালো একটা লিমাযিন পার্ক করা। রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড় করানো হয়েছে ওটাকে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে আরও কুলি নেমে আসছে, ট্রাক বহরের পিছনে মাথার বোঝা খালি করছে তারা। কার্গো শিপের উপর চারদিকে আলো জ্বলছে।

দুজন কুলির পিছু নিয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে নেমে আসতে দেখল রানা সাদা সুট পরা চাই-পাই দেওকে। এত দূর থেকেও ওর চোখে ধরা পড়ল বাটনহোলে এখনও লাল গোলাপটা রয়েছে; তবে আগের সেই গোলাপটাই কি না বলা মুশকিল।

দেওয়ের পাশে সুন্দরী এক থাই তরুণী রয়েছে। লাল স্কার্টের সঙ্গে সাদা পপলিনের টি-শার্ট পরেছে মেয়েটি, তার উপর খাটো একটা মিঙ্ক কোট। কাঁধ থেকে ঝুলছে বিরাট একটা হাতব্যাগ। পাঁচ ফুট তিন, স্বাস্থ্য ভাল, হাঁটার মধ্যে ক্ষিপ্র একটা ভাব। ফ্লাডলাইটের আলোয় তার পেশল পা দুটো যেন মার্বেলের স্তম্ভ।

আচ্ছা, নেগোশিয়েশনের জন্য চক্রি চুয়ান তা হলে তার বান্ধবীকেই পাঠিয়েছে, ভাবল রানা। এদের বান্ধবী সম্পর্কে ধারণা আছে ওর। আসলে রক্ষিতা।

ডক ধরে সোজা লিমাযিনের দিকে এগিয়ে এল তরুণী, পিছনে কারবাইন হাতে দুজন থাই। বোঝাই যাচ্ছে যে থাই থান্ডার তাদের নেগোশিয়েটরকে বডিগার্ড ছাড়া পাঠায়নি।

চাই-পাই দেও আর তরুণীকে আসতে দেখে স্যালুট করল শোফার, তারপর লিমাযিনের দুটো দরজাই খুলে দিল। থাই বডিগার্ডদের নিয়ে ব্যাকসিট উঠে বসল তরুণী। দেও বসল সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে। ড্রাইভিং সিটে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার।

'এই রাস্তা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?' ফিসফিস করল লাবণী।

'নিশ্চয়ই দুর্গে,' বলল রানা। 'তবে এখনই আমরা সেখানে যাচ্ছি না। প্রথমে প্লেনটাকে খুঁজে বের করতে হবে, আদৌ যদি সেটার কোনও অস্তিত্ব থাকে।'

ঝোপ-ঝাড় থেকে না বেরিয়ে এগোচ্ছে ওরা, রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে। ঢালের মাথায় উঠে এসে সামনে তাকাতে নীচে একটা বিশাল উপত্যকা দেখতে পেল ওরা।

'ও আল্লাহ!' মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল লাবণী। 'কী সুন্দর, না?'

নিজের বেল্ট থেকে একজোড়া নাইটগ্লাস বের করে দুর্গের দিকে তাকাল রানা। উপত্যকার মাঝখানে, ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত, বিরাট সেই প্রাচীন দুর্গ। পাহাড়ের উপর থেকে দেখে এর সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য কিছুই বোঝা যায়নি। যেন ওয়াল্ট ডিজনি-র কোনও সিনেমা থেকে তুলে এনে পরিখা সহ এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে দুর্গটাকে, প্রকাণ্ড আকারের কংক্রিট ব্লক-এর সমষ্টি। কালো লিমাযিনটাকে দেখতে পেল ও, ড্রব্রিজের উপর দিয়ে এগোচ্ছে।

রানার গায়ে সেঁটে এল লাবণী। 'মাসুদ ভাই, সেই ছোটবেলা থেকে কেল্লা আমার অসম্ভব ভাল লাগে!'

চোখ থেকে নাইটগ্লাস নামাবার আগে দুর্গের ছাদের দিকে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল রানা। প্রথমে চিনতে পারল না, কালো রঙের কী যেন একটা রয়েছে ওখানে। ভাল করে তাকাতে বুঝতে পারল ওটা আসলে বড় আকৃতির একটা যান্ত্রিক ফড়িং – হেলিকপ্টার।

এরপর নিজেদের চারপাশে চোখ বুলাল রানা। ওদের ডানদিকে খাড়া পাহাড়প্রাচীর, আকাশের গায়ে নিকষ কালো পরদার মত ঝুলে আছে। ওটার ঠিক উল্টোদিকে উজ্জ্বল হাসি ছড়াচ্ছে মস্ত চাঁদটা। ডানদিকেই, খানিক দূরে, ক্রমশ উঁচু একটা ঢাল। 'এসো, খানিক ওপরে উঠি।' নাইটগ্লাস বেল্টের খাপে গুঁজে

রাখল ও।

রানার পিছু নিয়ে এগোল লাবণী। ঢালের মাথায় উঠে আসতে সাত মিনিট লাগল ওদের। ওখানে থেমে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা।

চাঁদের আলোয় উপত্যকাটা বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

'পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা গেছে প্লেনটা,' লাবণীকে বলল রানা। 'কিন্তু এখন নেই। বলো, কোথায় লুকিয়ে রাখা সম্ভব?'

'আন্ডারগ্রাউন্ডে?' বলল লাবণী।

'হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু প্লেনটাকে তুমি আনবে কীভাবে? আন্ডারগ্রাউন্ডে তো আর ল্যান্ড করাতে পারবে না। তোমার একটা রানওয়ে থাকতে হবে।' আবার চারদিকে চোখ বুলাল ও।

চাঁদের আলোতেও সব কিছু পরিষ্কার নয়। কাছাকাছি অনেকগুলো ঢাল, তারই একটার মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ঢালগুলোর মাঝখানে সমতল জমিন, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা। আলো ঝলমলে দুর্গটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও, সেটার পিছনে বড় আকারের বেশ কিছু গাছ। সেগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

'মাসুদ ভাই, আমাদের শোনার চেষ্টা করা উচিত নয় দুর্গে বসে ওরা কী আলাপ করছে?'

'প্রথমে রানওয়েটা দেখতে চাই,' বলল রানা। 'লম্বা একটা রানওয়ে কীভাবে তুমি লুকাবে?'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে রয়েছে লাবণী, ঝোপের একটা পাতা ছিঁড়ল। 'ঝোপ দিয়ে ঢেকে রাখব,' বলল সে।

'কিংবা গাছ দিয়ে,' হাত তুলে দেখাল রানা। সিধে হয়ে সেদিকে তাকাল লাবণী। 'ওই গাছগুলো দেখছ? ওগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে?'

চোখ কোঁচকাল লাবণী। 'দেখে মনে হচ্ছে খুব সাজানো

গোছানো, যেন খুব যত্ন নেয়া হয়।'

'ঠিক ধরেছ। সারিগুলো পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত। চারদিকের বাকি গাছপালার মধ্যে এই শৃংখলা দেখা যাচ্ছে না। কেন?'

'থাই টং চিফ একজন বৃক্ষ-প্রেমিক?'

'এসো।' ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে রানা, ওর পিছু নিল লাবণী। কোনও ট্রেইল নেই, তবে শিশির পড়ায় ভিজে নরম হয়ে আছে ঝোপের ডালপালা। ওদের পরনের কুলির পরিচ্ছদও ভিজে গিয়ে গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে।

আরেকটা ঢালের মাথায় উঠে এসে ইঁট বিছানো রাস্তার পাশে বসল ওরা, ঝোপ ফাঁক করে দেখল বাক্সভর্তি প্রথম ট্রাকটা নীচে নেমে যাচ্ছে। ট্রাক চলে যাওয়ার পর রাস্তা পেরিয়ে উপত্যকায় নেমে এল ওরা। এখানে ঝোপঝাড় কম, উপত্যকাটা চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ঘাসে ঢাকা।

রানার পিছু নিয়ে হন হন করে হাঁটছে লাবণী, দুর্গটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। কোনও আড়াল পাচ্ছে না ওরা। তবে চাঁদটা মেঘের ওপাশে থাকায় চারদিক ছায়ায় ঢাকা।

গাছগুলো এখনও সিকি মাইল দূরে, অথচ লাবণী পিছিয়ে পড়েছে। 'মাসুদ ভাই,' চাপা গলায় ডাকল সে। 'একটু আস্তে হাঁটো।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। লাবণী কাছে আসতে বলল, 'তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল নিয়ে দুর্গের ছাদ থেকে একজন স্নাইপার কী করতে পারে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা মানে তাকে আরও সহজ টার্গেট পাইয়ে দেয়া।'

হাঁটার গতি আগের চেয়ে কমাল রানা, লাবণী যাতে ঠিক ওর পাশেই থাকতে পারে। তার ফতুয়ার সামনের দিকে ইন্টারেস্টিং একটা নড়াচড়া লক্ষ করে হাসতে শুরু করল ও।

বুকের উপর হাত দুটো ভাঁজ করল লাবণী, তারপর কঠিন

চোখে তাকাল ওর দিকে। এই ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ হাঁটল সে, তবে খানিক পরেই নামিয়ে নিল হাত দুটো। অবশেষে গাছগুলোর কাছাকাছি পৌঁছাল ওরা।

সামনে বাধা। আট ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে দুজন। মুখ তুলে উপরদিকে তাকাল রানা। বেড়ার ছয় ইঞ্চি উপরে আলাদা এক প্রস্থ তার দেখল।

বেড়ার গায়ে হেলান দিতে যাচ্ছে লাবণী। ঝট করে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিল রানা, তারপর হাত তুলে নিঃসঙ্গ তারটা দেখাল। সেদিকে তাকিয়ে নিজের গলায় হাত দিল লাবণী। 'বিদ্যুৎ!' বলল সে। 'এখন তা হলে উপায়, মাসুদ ভাই?'

বেড়ার ওপারে গাছগুলো ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। 'এসো, দেখা যাক গেটটা পাই কি না।'

'তোমার সঙ্গে হাঁটা মানে তো দৌড়ানো।'

'না, দৌড়াতে হবে না। তবে কোনও শব্দ নয়।'

বেড়ার পাশ ঘেঁষে হাঁটছে ওরা, লম্বা ঘাসের বদলে এখন আবার ঝোপ-ঝাড়েরই প্রাধান্য বেশি দেখা যাচ্ছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরটা বারবার দেখবার চেষ্টা করল রানা, তবে সযত্নলালিত গাছগুলো ছাড়া আর কিছু ওর চোখে পড়ল না।

ঝোপ-ঝাড় ঘন হয়ে ওঠায় এগোবার গতি কমে এসেছে। দুর্গের পিছন দিক ঘেঁষে হাঁটছে ওরা। উঁচু জায়গায় রয়েছে, ফলে দুর্গের সামনের ইঁট বিছানো রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে রানা। হেডলাইট দেখে বোঝা গেল বাক্সভর্তি আরেকটা ট্রাক আসছে।

দুর্গটাকে পিছনে ফেলে আসবার পর সামনে বেড়ার একটা কোণ দেখতে পেল ওরা। বাঁক ঘুরে বাঁ দিকে চলে গেছে ওটা। হাত তুলল রানা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল লাবণী, চেহারা চকচক করছে। তার চোখ দুটো কী যেন খুঁজছে ওর মুখে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' ফিসফিস করল রানা। 'বাঁকের ওদিকে কী আছে দেখতে যাচ্ছি আমি।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল লাবণী।

মাথা নিচু করে এগোল রানা। বেড়ার কোণে পৌঁছে মাটিতে হাঁটু গাড়ল, শ্বাস নিল বুক ভরে। তারপর সাবধানে কোণের ওদিকে মাথাটা বাড়িয়ে বেড়া বরাবর তাকাল। ওর কাছ থেকে দশ গজ দূরে বড় একটা গেট। খোলা সেটা। কাঁধে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন চিনা গার্ড। তার মাথাটা সামনের দিকে নত করা, সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। রানার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে।

অপেক্ষা না করে বেড়ার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে এগোল রানা। এদিকে কোনও ঝোপ বা ঘাস নেই, শুধু শক্ত মাটি। সিগারেট ধরানো শেষ করে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই লোকটার কাছে পৌঁছাতে চায় ও। দু'বার ক্লিক করল লাইটার, তারপর আগুন জ্বলল। সিগারেটের শেষ প্রান্তে আগুন ছুঁইয়ে লম্বা টান দিল সে।

তার পিছনে পৌঁছে যাচ্ছে রানা। ওর হাতে ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁটে আঙুল তুলে সিগারেট নামাল গার্ড, মুখ তুলে কালো আকাশ লক্ষ্য করে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর ঘুরতে শুরু করল।

ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই পৌঁছে গেল রানা। বাঁ হাত দিয়ে তার কাঁধে ঘুসি মারল ও, মোচড় খেয়ে আগের অবস্থায় ফিরে গেল সে। ওর ডান হাতে ধরা ধারাল ছুরি পোঁচ দিল গলায়।

কলকল শব্দ পেল রানা। সিগারেট পড়ে যাচ্ছে। রাইফেলটা কাত হয়ে বেড়ার গায়ে লাগতেই চারদিকে আগুনের ফুলকি ছুটল। রাইফেলের পিছু নিল গার্ড। বিদ্যুতের স্পর্শ পেতেই ঝাঁকি খেতে শুরু করল শরীরটা। মাটিতে ঢলে পড়ল সে, মুখের যেখানে বেড়াটা লেগেছিল সেখানে কাটাকুটির মত পোড়া দাগ দেখল রানা।

ঘুরে লাবণীর দিকে ফিরল ও। সঙ্গে সঙ্গে জমে পাথর হয়ে

গেল। সামনে আরও দুজন চিনা গার্ড, তাদের রাইফেল ওর পেটের দিকে তাক করা।

'একদম নড়বে না,' নাকি সুরে বলল তাদের একজন।

নয়

ছুরিটা এখনও রানার হাতে। হাত দুটো শরীরের পাশে ঝুলছে। স্থির দাঁড়িয়ে আছে ও।

'ছুরি ফেলে দাও,' বলল গার্ড।

খাকি হাফ প্যান্ট ও খাকি হাফহাতা শার্ট পরে আছে গার্ডরা। তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্তহীনতার কোনও লক্ষণ আছে কি না বুঝতে চেষ্টা করছে রানা। নেই দেখে হাতের ছুরিটা ছেড়ে দিল। ওদের পিছনে একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। মাথা নিচু করে সাবধানে, দ্রুত এগোচ্ছে লাবণী।

মাথার উপর হাত তুলল রানা। 'মিস্টার জিকো তানাই পাঠিয়েছেন আমাকে,' চিনা ভাষায় বলল ও। 'শোনা যাচ্ছে দলে বেঈমান আছে।'

দুজন গার্ডই নিঃশব্দে হাসল। যে কথা বলছিল, রানার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকাল। 'কোনও বেঈমান নেই,' বলল সে। 'শুধু বিদেশি শত্রু আছে।'

রানার ডানদিকের গার্ডকে আঘাত করল লাবণী, যে-লোকটা বেড়ার কাছ থেকে দূরে রয়েছে। লোকটার পিছনে পৌঁছানোর আগে নিজের গতি কমাল সে। ধারাল ছুরিটা আগেই বেরিয়ে এসেছে হাতে। কাজটা খুব দ্রুত ও সহজে সারল সে।

তার হাত লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে এগিয়ে এল, ছুরিটা ঝাঁকি খেল গলা বরাবর। চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এসে শার্টের সামনেটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। বড় বড় হয়ে উঠল তার চোখ দুটো, তারপর নিস্তেজ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটার চোখ দেখছিল রানা। ওগুলো ওকে ছেড়ে তার সঙ্গীর দিকে ছুটে যেতেই লাফ দিল ও।

প্রথমে ডান হাতের ধাক্কায় তার রাইফেলের নলটা নিজের দিক থেকে সরাল রানা, সেই সঙ্গে বাম হাতে প্রচণ্ড এক আপার কাট মারল তার চিবুকের নীচে। হোঁচট খেল সে, বাড়ি খেল বেড়ার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ আগুনের ফুলকি ছুটল। আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীরটা। ঠোঁট দুটো ভাঁজ হয়ে দাঁতের ফাঁকে ঢুকে গেল। গোটা শরীর ঝাঁকি খাচ্ছে ও কাঁপছে। তারপর বেড়া থেকে খসে পড়ে স্থির হয়ে গেল সে।

একটা লাশের কাপড়ে ছুরির ফলা ঘষল লাবণী। রানাও নিজের ছুরিটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিল বাহুর সঙ্গে আটকানো খাপে। তারপর দুজনেই ওরা গেটের ভিতর তাকাল। 'গাছগুলো দেখো,' বলল রানা।

চার সারিতে লাগানো হয়েছে গাছগুলো। দু'দিকে দুটো করে সারি। ওগুলোর মাঝখানে একটা অ্যাসফল্ট হাইওয়ের মত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে রানওয়েটা। গাছগুলোর সমস্ত মগডাল, সম্ভবত স্থানান্তর উপযোগী, বাঁকা হয়ে ঝুলে পড়েছে রানওয়ের উপর, ফলে উপর

থেকে ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। গাছগুলো খুব কাছাকাছি হওয়ায় পাশ থেকেও বোঝা যায় না যে ওখানে একটা রানওয়ে আছে।

গেট ও রানওয়ের মাঝখানে কাঠের বিরাট হ্যাঙ্গারটা দেখতে পাচ্ছে ওরা। লাবণীকে নিয়ে ওটার দিকেই এগোল রানা।

বিশ গজের মত এগোবার পর হ্যাঙ্গারের পিছনদিকে, রানওয়ের উপর ছোট একটা হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা, সম্ভবত টু-সিটার।

হ্যাঙ্গারের খোলা মুখের পাশে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভাল করে দেখছে ওরা। আলো জ্বলছে, তবে কোথাও কিছু নড়ছে না।

দুজনের হাতেই পিস্তল বেরিয়ে এল, সাবধানে কংক্রিটের মেঝেতে পা দিল ওরা। প্রতিটি দেয়াল বরাবর মেঝেতে ফাটল রয়েছে। চারদিকে বড় আকারের অনেক ড্রাম দেখতে পাচ্ছে ওরা, ওগুলোর মাঝখানে একাধিক ওঅর্কবেঞ্চ রয়েছে।

দেয়ালের নীচের সরু ফাটল পরীক্ষা করছে লাবণী, রানা পরীক্ষা করছে প্রতিটি ওঅর্কবেঞ্চ।

বেঞ্চগুলোয় এখনও অনেক টুলস পড়ে আছে, সেই সঙ্গে প্লেনের ছোটখাট পার্টস ও নোংরা ন্যাকড়ার অসংখ্য টুকরো। ড্রামগুলো সলভেন্টে ভর্তি। হ্যাঙ্গারটা আকারে যথেষ্ট বড়, অনায়াসে একটা জেট প্লেন রাখা যাবে। কিন্তু এখানে কোনও প্লেনই নেই, দুরন্ত ঈগল তো পরের কথা।

কোমরে হাত রেখে হাঙ্গারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। ওর দিকে হেঁটে আসছে লাবণী।

'কী মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'গোটা ফ্লোরটাই যেন বিরাট একটা এলিভেটর।'

হাসল রানা। 'অর্থাৎ?'

আঙুল দিয়ে নিজের জুতো জোড়ার মাঝখানটা দেখাল লাবণী। 'ওখানে আছে প্লেনটা, হ্যাঙ্গারের নীচে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘অসম্ভব নয়। আমার ধারণা, দুর্গ ও এই হ্যাঙ্গারের মাঝখানে আসা-যাওয়ার পথ আছে – সম্ভবত একটা টানেল।’

‘আমারও তাই ধারণা।’

‘এবার আমরা চাই-পাই দেও আর তার বস জিকো তানাইয়ের খবর নিতে যেতে পারি।’

চোখ বড় বড় করল লাবণী। ‘আমরা হামলা চালিয়ে দুর্গ দখল করব?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘তবে তার আগে একটা ডাইভারশন ক্রিয়েট করা দরকার না?’

চারদিকে চোখ বুলাল লাবণী। ‘ঠিক কী ধরনের ডাইভারশনের কথা ভাবছ তুমি?’

‘শুকনো কাঠ জ্বালানি হিসেবে খুব ভাল,’ বলল রানা, লাবণীর মত সে-ও চারদিকে চোখ বুলাল। ‘হ্যাঙ্গারের ছাদ ও দেয়াল কাঠের তৈরি।’

যতগুলো সম্ভব ন্যাকড়া যোগাড় করল ওরা। ড্রাম থেকে একটা বালতিতে সলভেন্ট ঢালল রানা, ন্যাকড়ার সাহায্যে চারদিকের দেয়াল ওই সলভেন্ট দিয়ে ভেজানো হলো। সবশেষে লাইটার জ্বেলে ভিজে একটা ন্যাকড়ায় আগুন ধরাল রানা। গন্ধটা অসহ্য। প্রচুর ধোঁয়া।

লম্বা ন্যাকড়ার কোণ ধরে প্রতিটি দেয়ালের গা ঘেঁষে হেঁটে গেল রানা, তারপর সেটা ছুঁড়ে দিল মেঝের এক কোণে। মেঝে বরাবর ছোট ছোট শিখা জ্বলে উঠল। তারপর আগুন ধরল সবগুলো দেয়ালে। শিখাগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। উথলানো, মোচড় খাওয়া ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে ক্যাটওআক ছাড়িয়ে সিলিঙের দিকে।

হ্যাঙ্গার ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আগে সলভেন্ট ভর্তি একটা ড্রাম উল্টে দিল রানা। গাঢ় রঙের তরল পদার্থ কংক্রিটের

মেঝেতে গড়াতে শুরু করল। সরু কয়েকটা ধারা জ্বলন্ত দেয়ালের নাগাল পেতে যাচ্ছে।

'খুব গাঢ় সলভেন্ট, সরু ফাটল দিয়ে নীচে নামবে?' জিজ্ঞেস করল লাবণী।

'না নামলেও ক্ষতি নেই,' বলল রানা। 'আমাদের উদ্দেশ্য ওদেরকে এদিকে ব্যস্ত রাখা।'

গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, কাঁটাতারের বেড়া বরাবর হাঁটছে। আগুনটা এত তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়, তা ছাড়া হাঙ্গারটা আগেই আড়ালে পড়ে গেছে। বেড়ার কোণ ঘুরে ঝোপের ভিতর ফিরে এল ওরা। সাবধানে হেঁটে একসময় দুর্গটার সরাসরি পিছনদিকে পৌঁছাল।

এখান থেকে কোনও আড়াল পাওয়া যাবে না, ঘাসের উপর দিয়ে পরিখার দিকে এগোচ্ছে দুজন। এই সময় রাস্তার উপর আরেকটা ট্রাকের হেডলাইট দেখতে পেল রানা।

পরিখার দুই পারই সামান্য উঁচু। ক্রল করে ঢালটুকু উঠল ওরা, তারপর চোখ তুলে দুর্গের পিছনের পাঁচিলের উপর চোখ বুলাল।

কোনও কোনও চৌকো জানালা থেকে ম্লান হলুদ আলো বেরুচ্ছে। রানার চোখে কোথাও এতটুকু নড়াচড়া ধরা পড়ল না। যে কংক্রিট ব্লক দিয়ে দুর্গের পাঁচিল তৈরি সেগুলো বেশ ফাঁক রেখে বসানো, ফলে একটা জানালা পর্যন্ত উঠতে খুব একটা সমস্যা হবে না।

রানার জানা নেই পরিখাটা কত গভীর। একটু শীত শীত ভাব আছে, সাঁতরানোর কোনও ইচ্ছে নেই ওর। দুই পারের দূরত্ব প্রায় বিশ ফুট, মাঝখানে গাঢ় রঙের পানি।

'হয়তো খুব একটা গভীর নয়, হেঁটেই পার হওয়া যাবে,' ফিসফিস করল রানা। 'আগে আমাকে দেখতে দাও।'

ঢাল বেয়ে নেমে গেল রানা, পানিতে ডান পা নামিয়ে

গভীরতা মাপছে। পরিখার কিনারা ঘেঁষে এক ফুট নেমে গেল ওর পা। পানি ঠাণ্ডা নয়। এবার বাম পা ডোবাল, ডান পা আরও একটু সামনে বাড়িয়ে দিল। গভীরতা খুব বেড়েছে বলে মনে হলো না।

তবে পরিখার তলাটা পিচ্ছিল কাদায় ঢাকা। ডান পায়ে ভর দিয়ে বাম পা ওটার পাশে আনতে যাচ্ছে রানা। পিছলে আরও একটু সামনে সরে যাওয়ার সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর।

যেন মনে হলো কেউ ওর জুতোর ভিতর দিয়ে পিন ঢোকাচ্ছে পায়ে। নীচে তাকাল রানা, দেখল ওর পায়ের চারপাশের পানি ছলকাচ্ছে। কী হচ্ছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর।

'মাসুদ ভাই!' চেঁচিয়ে উঠল লাবণী।

বন করে আধ পাক ঘুরল রানা, এক লাফে পানি থেকে উঠল, পড়িমরি করে ঢালের মাথায় লাবণীর দিকে এগোচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওকে সাহায্য করল লাবণী।

তার পাশে বসে জুতো জোড়ার দিকে তাকাল রানা। একজোড়া খুদে বাস্টার্ড এখনও কামড়ে ধরে আছে ওর জুতো। দু'জোড়া জুতোই ছিঁড়ে ফালি ফালি করে ফেলেছে।

খুদে একটা মাছকে জুতো থেকে ছাড়িয়ে চাঁদের আলোয় ধরল রানা। ওর মুঠোয় ছটফট করছে, মোচড় খাচ্ছে ওটা। শরীরটা খাটো ও চ্যাপ্টা। মুখের সামনে কাঁটার মত দাঁত গিজগিজ করছে।

নিঃশ্বাস ফেলবার সময় লাবণীর শরীরটা কেঁপে গেল। 'মাই গড, মাসুদ ভাই!'

'পিরানহা,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'একজন মানুষের হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে দুমিনিটেরও কম সময় লাগে ওগুলোর। রাক্ষসে বোঝাই হয়ে আছে পরিখা। সাঁতরে পার হওয়া সম্ভব

নয়।'

'ড্রব্রিজ,' মৃদুকণ্ঠে বলল লাবণী।

মাথা ঝাঁকাল রানা। পরিখার পার ঘেঁষে মাথা নিচু করে এগোল ওরা। পরিখার সঙ্গে বাঁক নিচ্ছে, ধীরে ধীরে পৌঁছে যাচ্ছে দুর্গের সামনের দিকটায়। দূর থেকেই আরেকটা ট্রাকের হেডলাইট দেখতে পেল, ড্রব্রিজ পেরুচ্ছে।

হেডলাইটের আলোয় ফটকের ভিতরটা দেখতে পেল ওরা। বিরাট বড় একটা উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাকগুলো। বিদেশি কুলিরা কাঠের বাক্স নামাতে ব্যস্ত।

ড্রব্রিজের কাছে পৌঁছাল ওরা। দ্রুত ওটার নীচে, পরিখার কিনারায় গা ঢাকা দিল। মাথার উপর হাত তুলে ব্রিজের তলাটা স্পর্শ করল রানা। ডায়ামিটারে আধ ইঞ্চি একটা সাপোর্ট রেইল রয়েছে, চলে গেছে পরিখার উপর দিয়ে। ব্রিজের কাঠ আর ওটার মাঝখানে প্রায় তিন ইঞ্চি ফাঁক।

লাবণীর হাতটা ধরে ওই রেইলের উপর তুলে দিল রানা। ব্রিজের নীচে চাঁদের আলো নেই। তার অস্তিত্ব রানার পাশে স্রেফ একটা ছায়া মাত্র। ছায়াটাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল ও।

রেইলটাকে দু'হাতে শক্ত করে ধরল রানা, তারপর ওটার উপর জুতোর গোড়ালি আটকাল। এবার পরিখার উপর দিয়ে এগোবার জন্য পালা করে একবার ডান হাত, একবার বাম হাত বাড়িয়ে সামনের রেইল ধরছে। পানির সারফেস দু'ফুটেরও কম নীচে। রানার গায়ের ঢোলা ফতুয়ার কিনারা ভিজে গেল।

পরিখা পিছনে ফেলে এল রানা, মাটিতে পা নামাল, রেইল ছেড়ে উবু হয়ে বসে থাকল লাবণীর অপেক্ষায়। ওর ঠিক পিছনেই ছিল লাবণী। পাশে চলে আসতে নামতে সাহায্য করল তাকে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ওরা, তারপর কুঁজো হয়ে হনহন করে এগোল দুর্গের কোণ লক্ষ্য করে। বাঁকটা ঘোরার পর কাছাকাছি জানালার দিকে তাকাল রানা। দশ ফুট উপরে

ওটা, তবে ভিতরে আলো জ্বলছে।

আরও একটু সামনে এগোল রানা। দুর্গের পাঁচিল ও পরিখার মাঝখানে পাঁচফুট চওড়া বালি ভরা একটা বিস্তৃতির মধ্যে রয়েছে ওরা। বিশ গজের মত এগোবার পর বারো ফুট উপরে আরেকটা জানালা দেখল রানা। এটা অন্ধকার।

পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। কংক্রিটের ব্লকগুলো বালি ও সিমেন্টের মিশ্রণ দিয়ে জোড়া লাগানো। জোড়ার জায়গাগুলো আধ ইঞ্চির মত গভীর, ফলে বেরিয়ে থাকা ব্লকের ঠোঁটে হাত ও পায়ের আঙুল রেখে উঠে যেতে পারছে রানা।

জানালার কাছে পৌঁছে থামল, পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল, তারপর গোবরাট টপকে নেমে পড়ল অপরদিকে। এক মুহূর্ত পর ঘুরল রানা, নীচের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়াল লাবণীকে সাহায্য করবার জন্য।

কিছুটা উঠে মাথার উপর হাত তুলল লাবণী, কবজিটা ধরতে দিল রানাকে। হঠাৎ পা পিছলে যাওয়ায় তার শরীরের সবটুকু ওজন টান দিল রানার বাহুতে, মনে হলো জানালা গলে বেরিয়ে যাবে শরীরটা। অপর হাত বাড়িয়ে লাবণীর বগলের তলায় ঢোকাল রানা, ধীরে ধীরে টেনে তুলে আনছে তাকে। জানালার ফাঁকে কাঁধ ঢোকাবার পর ব্লকের ঠোঁটে আবার পা বাধাতে পারল লাবণী, জানালা গলে ভিতরে ঢুকল পুরো শরীর।

দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে দম নিচ্ছে লাবণী। 'হঠাৎ মনে হলো পানিতে পড়ে গেছি আমি, পিরানহার ঝাঁক ছেঁকে ধরেছে আমাকে।'

তার ঠাণ্ডা নাকের ডগাটা একবার স্পর্শ করল রানা। 'এখন আর ভয় করছে না তো?'

মাথা নাড়ল লাবণী। তারপর কামরার চারদিকে চোখ বুলাল সে। 'ওহ্, মাসুদ ভাই!'

চাঁদের আলোয় কামরাটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটা

লাবণীর ছোটবেলার স্বপ্ন পুরণ করছে, সন্দেহ নেই। দেয়ালগুলো সাদা রঙ করা। মেঝেতে কার্পেট, তাও সাদা। কাঠের একটা ডেস্ক রয়েছে, ওটার পিছনে উঁচু পিঠ সহ একটা চেয়ার। বিছানাটা কামরার মাঝখানে। লাল ভেলভেট মনে হলো চাদরটাকে। গদিটা এত উঁচু, প্রায় রানার কোমর সমান। মাথার উপর একটা চাঁদোয়া টাঙানো, সেটাও লাল, চারদিকে সাদা লেস ঝুলছে।

ওটার দিকে ছুটে গেল লাবণী, লাফ দিয়ে গদিতে উঠে ড্রপ খেলো। বিছানার দু'পাশে নাইট স্ট্যান্ডে মোমবাতি বসানো। সিলিং থেকে ঝুলছে একটা ঝাড়বাতি।

'তুমি কি আমার সেই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুর?' জিজ্ঞেস করল লাবণী।

নিজের ঠোঁটে একটা হাত রাখল রানা। 'শ্‌শ্‌শ্‌!' কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে ও।

ওর দেখাদেখি লাবণীও কান পাতল।

কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। তবে কাছাকাছি কোথাও থেকে নয়। কী নিয়ে যেন তর্ক করছে কারা।

পিছু নেওয়ার ইশারা করে দরজার দিকে এগোল রানা। কবাট খোলার সময় লাবণীর নিঃশ্বাস অনুভব করল ঘাড়ে।

করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। দেয়ালের গায়ে খানিক পরপর হোল্ডার লাগানো আছে, মোমবাতি জ্বলছে সেগুলোয়। চিনা ও থাই ভাষায় আলাপ কাছে কারা যেন। অসন্তুষ্ট একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে রানা, থাই ভাষায় চিৎকার করছে। সন্দেহ নেই কী কারণে যেন থাই থান্ডারের লিডার চক্রি চুয়ানের বান্ধবী খুব রেগে গেছে।

আওয়াজটা আরও সামনে থেকে ভেসে আসছে। দেয়াল ঘেঁষে সেদিকে এগোল ওরা। বেশ কয়েকটা কামরাকে পাশ কাটিয়ে এল, তবে সব দরজায় কবাট নেই, কিছু দরজা স্রেফ খিলান, ফাঁক বন্ধ করবার কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এরকম একটা চওড়া খিলানের ভিতর থেকে তর্ক-বিতর্কের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। খিলানটার উপরে কাঠের তৈরি একটা ড্রাগনের মাথা ঝুলছে।

চক্রি চুয়ানের বান্ধবী তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলছে, 'এসব কী বলছেন আপনি! এখানে তাইওয়ানিজ টং-এর চিফ মো পাই স্বয়ং উপস্থিত। আমি থাই থান্ডারের তরফ থেকে তাঁর কাছেই বিচার দিচ্ছি। আপনিই বিচার করে বলুন, থাই টং আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করছে কি না...'

দশ

তাইওয়ান, তাইপে। চিয়াং কাইশেক এভিনিউ।

তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার। লেফটেন্যান্ট জেনারেল চেং চি শিয়ান-এর চেম্বার।

চিফ চেং চি শিয়ানের সামনে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে তাইওয়ানিজ টং-এর দুর্ধর্ষ দলপতি মো পাই। প্রকাণ্ড শরীর তার, চেহারাও ভয়ঙ্কর, কিন্তু সিক্রেট সার্ভিসের চিফের সামনে এই মুহূর্তে বসে আছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে। শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ছে তার। বিড় বিড় করে বলছে, 'পায়ে পড়ি, আপনার! মাফ করে দিন আমাকে! আর করব না, সার।'

'আরে, মর জ্বালা!' লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান বিরক্ত। 'তখন থেকে বলছি, কোনও অপরাধের কারণে তোমাকে ধরে আনা হয়নি, কাজেই মাফ চাওয়ার দরকার নেই।'

তাইওয়ানিজ টং লিডার মো পাইয়ের এতক্ষণে যেন বোধোদয় হলো। 'অপরাধ করিনি? তা হলে কী কারণে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে ধরে আনা হয়েছে, সার?'

লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান ইশারা করতে মো পাইয়ের হাতকড়া খুলে দিল একজন গার্ড। 'বেআইনী কাজ করে টাকা আর অন্যায় করে পাপ তো আর কম কামাওনি, এবার জন্মভূমির ঋণ কিছুটা শোধ করো, মো।'

'জী, সার। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।' ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে মো পাইয়ের। তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসকে যমের চেয়েও বেশি ভয় পায় সে।

কাজটা ধীরেসুস্থে তাকে বুঝিয়ে দিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান। 'একটা পরাশক্তির প্ল্যান এটা। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আমাদের প্রতিবেশীর তৈরি এবং ডক্টর নাদিরার ডেভেলপ করা জেট প্লেন দুরন্ত ঈগলকে হাইজ্যাক করে এনে তোমার পৌঁছে দিতে হবে থাইল্যান্ডে। কোনও ট্রেস থাকলে চলবে না।

'একই সঙ্গে ঢাকা থেকে ধরে আনতে হবে ডক্টর নাদিরাকেও। কিন্তু থাইল্যান্ডে নয়, তাঁকে ডেলিভারি দিতে হবে সিঙ্গাপুরে।'

প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যসহ একটা ফোল্ডার দেওয়া হলো মো পাইকে। বলা হলো, প্রতিটা তথ্য মুখস্থ করে নখদর্পণে রাখতে হবে। আজই দশজনের একটা বোর্ডের সামনে পরীক্ষা দিতে হবে তার। বোর্ডে বিদেশী মুরুব্বিরাও থাকবে কয়েকজন। কোথাও সামান্যতম ভুল হলে চলবে না। আর গোপনীয়তার নিশ্চয়তা দিতে হবে শতকরা একশো ভাগ।

সবশেষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান বললেন আসল কথাটা, 'এই কাজটা সুষ্ঠুভাবে করা ও করানোর জন্যে তোমাকে অনেক টাকা দেয়া হবে। মোট পাবে ষাট মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বুঝতেই পারছ, কতটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন এটা। আরেকটা কথা, কাজটা তোমরা একা যদি করতে না পার, অন্য এক বা একাধিক গ্রুপের সাহায্যও নিতে পারবে – ওই পরাশক্তির তাতে কোনও আপত্তি নেই। তবে এই টাকার ভাগ দিতে হবে তাদেরকে, গ্যারান্টি দিতে হবে গোপনীয়তার।'

ষাট মিলিয়ন? তাইওয়ানিজ টং প্রধান মো পাইয়ের মাথা ঘুরছে। প্রশ্ন করে জেনে নিল সে, টাকাটা ষাট মিলিয়ন মার্কিন ডলারই কি না।

'কি, পারবে?'

উত্তর দেওয়ার আগে বিশ সেকেন্ড চিন্তা করল মো পাই। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝতে পারছি, সার, আপনার নিজের এতবড় নেটওঅর্ক থাকতে আমাকে ডেকেছেন কেন। আপনারা ক্লিন থাকতে চান। বেইজিং টের পেলে আমারও অসুবিধা। কাজেই, আমিও ক্লিন থাকব।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ইদানীং থাইল্যান্ড আর সিঙ্গাপুরে দাপটের সঙ্গে নানান অপারেশন চালাচ্ছে থাই টং। ভাবছি কাজটা ওদেরকে দিয়ে করালেই বোধহয় ভাল হবে। ওরা হয়তো থাই থান্ডারকেও জড়িয়ে নিতে পারে। ঢাকায় থান্ডারের কানেকশন ভাল।'

'বেশ, তা হলে সে ব্যবস্থাই করো,' বললেন তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ। 'তবে কাউকে এক পয়সাও ঠকিয়ো না। এই কাজের সবচেয়ে বড় শর্তই হলো, এটা হতে হবে সফল ও ষোলোআনা নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র।'

'জ্বী, সার, বুঝেছি। না, ঠকাব না।'

'বেশ, এখনই শুরু করে দাও। ষাট মিলিয়ন ডলারের চেকটা ইন্টারভিউয়ে টিকলেই পাবে। তবে চোখের দেখা দেখে নিতে পারো একবার।' দুই হাতে দুই কিনারা ধরে চেকটা দেখালেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ান।

চোখ কচলে ভাল করে চেকটা দেখল মো পাই।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল শিয়ানের নির্দেশে ওখানে বসেই ফোল্ডারটা খুলে পড়তে হলো তাকে। সমস্ত তথ্য ও নির্দেশ লেখা আছে ওটায়। তার পড়া শেষ হতে তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিস চিফ বললেন, 'তোমার কোনও প্রশ্ন থাকলে করতে পার।'

'একটাই প্রশ্ন, সার,' বলল তাইওয়ানিজ টং প্রধান মো পাই। 'জানি এই কাজে ব্যর্থ হলে মেরে ফেলা হবে আমাকে। শুধু জানতে চাই সেটা কীভাবে – গুলি করে, নাকি...'

মাথা নাড়লেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। 'তোমাদের কাউকেই মেরে ফেলা হবে না,' আশ্বস্ত করবার সুরে বললেন তিনি। 'যাদের কারণে অপারেশন ব্যর্থ বলে মনে করা হবে তাদের সবাইকে শুধু একটা করে ইঞ্জেকশন দেয়া হবে।'

'ইঞ্জেকশন, সার?' একটা ঢোক গিলল মো পাই। 'কী ইঞ্জেকশন, সার?'

'এইডস্-এর।'

সেই রাতেই তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই থাই টং-এর লিডার জিকো তানাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করল। দীর্ঘ আলাপ ও অনেক হিসাব-কিতাবের পর কাজটা করে দিতে রাজি হলো থাই টং। তবে জিকো তানাই জানাল প্লেনটা যেহেতু থাইল্যান্ডে পৌঁছে দিতে হবে, এবং মূল অপারেশনটা হবে ঢাকায়, সেহেতু থাই থান্ডারকে না জানিয়ে কাজটা করা যাবে না। সে আরও বলল, ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদারদের সঙ্গে থাই থান্ডারের ভাল লিঙ্ক আছে, ওখানে তারা ড্রাগ পাচার করে।

সব শুনে তাইওয়ানিজ টং প্রধান মো পাই বলল, কাজটা থাই থান্ডারকে দিয়ে করালে তার কোনও আপত্তি নেই, জিকো তানাই যেভাবে ভাল বলে মনে করবে সেভাবেই কাজটা করাবে, তবে গোপনীয়তার নিশ্চয়তা দিতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট। থাই টংকে সে চল্লিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অফার করল।

থাই টং লিডার জিকো তানাই খুশিতে বাগ বাগ। তার ধারণা কাজটা সে থাই থান্ডারকে দিয়ে দশ মিলিয়ন ডলারেই করাতে পারবে। অর্থাৎ কোনও কাজ না করেই মাঝখান থেকে ত্রিশ মিলিয়ন ডলার লাভ করতে যাচ্ছে সে।

জিকো তানাইয়ের এত খুশি হওয়ার পিছনে আরও একটা কারণ আছে। নাটের গুরু সংশ্লিষ্ট পরাশক্তির ইন্টেলিজেন্স তাকে আরও একটা কাজ দিয়েছে – কী একটা কাজে তাদের গোপন একটা আস্তানা ওদেরকে ব্যবহার করতে দিতে হবে।

*

এরপর থাই থান্ডারের লিডার চক্রি চুয়ানের সঙ্গে আলোচনায় বসল থাই টং। কী অপারেশন, কোথায়, কীভাবে করতে হবে শুনে ধুরন্ধর চক্রি চুয়ান সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল তাদের সাহায্য ছাড়া এই কাজ টঙের পক্ষে সম্ভব নয়। ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে তাদের ভাল লিঙ্ক তো আছেই, সিঙ্গাপুরেও বৈধ-অবৈধ অনেক বিজনেস ফ্রন্ট আছে তাদের, আছে বেশ কয়েকটা সেফহাউসও। তারা চেয়ে বসল বিশ মিলিয়ন ডলার।

প্রথমে বিশ মিলিয়নে রাজি না হলেও, পরে বাধ্য হয়ে থাই থান্ডারের দাবি মেনে নিতে হলো থাই টংকে। কাজে হাত দেওয়ার আগেই খরচপাতির কথা বলে দশ মিলিয়ন ডলার চেয়ে নিল চক্রি চুয়ান, ঠিক হলো বাকি দশ মিলিয়ন কাজ শেষ হলে দেওয়া হবে তাকে।

কাজ বুঝে নিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম ছকে নিয়ে দু'দলে ভাগ হয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল থাই থান্ডার। প্রথম দলে থাকল পাঁচজন, দলনেতার নাম তাইম আনন্দ, সহকারী হো টাকসিন। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব দেবে চক্রি চুয়ান নিজেই, তার সহকারী থাকবে ধানাই ঠাকুর।

তারা রওনা হতেই চক্রি চুয়ানের প্রতিনিধি ও বিশ্বস্ত বাহক প্রেম তিলসুলানন্দ থাই টং-এর লিডার জিকো তানাইয়ের সঙ্গে

ব্যাংককে জরুরি মিটিঙে বসল।

প্রেম তিলসুলানন্দ জানাল, তার লিডার চক্রি চুয়ান তাকে বিশেষ একটা নির্দেশ দিয়ে গেছে। থাই থান্ডারকে এখনই, অর্থাৎ কাজ শেষ হওয়ার আগেই, বাকি দশ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। শুধু তাই নয়, কাজটায় যেহেতু ঝুঁকির মাত্রা খুব বেশি তাই বোনাস হিসাবে আরও বিশ মিলিয়ন দাবি করছে তারা।

কাজটা গলায় আটকে গেছে, এই পর্যায়ে তর্ক করে কোনও লাভ নেই, অগত্যা বাধ্য হয়ে থাই থান্ডারের অন্যায় দাবি মেনে নিল থাই টং। যে টাকাটা পাওনা ছিল, অর্থাৎ দশ মিলিয়ন ডলার, প্রেস তিলসুলানন্দকে পেমেন্ট করে দিল তারা, বলল বাকি বিশ মিলিয়ন কাজ শেষ হলে দেবে।

যথা সময়ে সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলো কাজ। অপারেশন সফল হয়েছে, এই খবর টেলিফোনে থাইল্যান্ডে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে থাই টং লিডার জিকো তানাইয়ের সঙ্গে আবার মিটিঙে বসল প্রেম তিলসুলানন্দ, বলল, এবার বাকি বিশ মিলিয়ন ডলার দাও।

জিকো তানাই খবর নিয়ে জানল, তার ব্যান সপ আস্তানায় সত্যি সত্যি একটা প্লেন পৌঁছেছে, তার লোকজন সেটার দায়িত্বও বুঝে নিয়েছে। তবে ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স সিঙ্গাপুরে পৌঁছেছে কি না সেটা জানা সম্ভব হলো না। সে ভাবল, প্লেনটাই তো আসল; সেটা যখন হাতে চলে এসেছে, তখন আর ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। পরিষ্কার ভাষায় প্রেম তিলসুলানন্দকে জানিয়ে দিল সে, 'যাও, ভাগো, আর একটা পয়সাও পাবে না।'

আকাশ থেকে পড়ল নন্দ। 'কিন্তু কেন?'

'তোমাদের দাবি ছিল অযৌক্তিক, অন্যায় ও হাস্যকর, তাই।'

নন্দ জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে দিতে রাজি হয়েছিলে কেন?'

জিকো তানাই জবাব দিল, 'উপায় ছিল না, তোমাদের অন্যায় দাবি বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল তখন। ঠিক আছে, বিশ

মিলিয়ন তো কোনও যুক্তির কথা নয়, এই নাও বিশ হাজার ডলার...'

থাই টং ও থাই থান্ডারের মধ্যে এই নিয়েই বিরোধ। থাই থান্ডার একটা প্লেন ঠিকই জায়গা মত পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু বাঙালি বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে সিঙ্গাপুর থেকে গায়েব করে দিয়েছে তারা। কীভাবে?

সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় থাই থান্ডারের এয়ার অ্যামবুলেন্সের গায়ে লেখা ছিল 'MOUNT ELIZABETH FLYING AMBULANCE'। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে ফেরার পর ল্যান্ড করবার কথা ছিল চাঙ্গি এয়ারপোর্টে।

মাউন্ট এলিজাবেথ ফ্লাইং অ্যামবুলেন্সের জন্য থাই ও তাইওয়ানিজ টংকে নিয়ে চাঙ্গি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল তাদের মুরুব্বিরা, বিশেষ একটা বোয়িং প্লেন নিয়ে। আগেই কথা হয়ে আছে, থাই থান্ডার এখানেই সংশ্লিষ্ট পরাশক্তির প্রতিনিধির হাতে তুলে দেবে বাঙালি বিজ্ঞানীকে। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে বোয়িং, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে দুনিয়ার আরেক প্রান্তে।

কিন্তু মাউন্ট এলিজাবেথ ফ্লাইং অ্যামবুলেন্স নামে কোনও প্লেন চাঙ্গি এয়াপোর্টে নামেনি।

থাই থান্ডার বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে প্লেনটাকে ল্যান্ড করায় সিঙ্গাপুরের তৃতীয় এয়ারপোর্ট তেনগাহ্-এ। প্লেনের নাম বদলে BLUE BIRD AIRWAYS রাখে তারা। ওখান থেকে একটা অ্যামবুলেন্সে তুলে বিজ্ঞানীকে গায়েব করে দিয়েছে।

কী ঘটছে আঁচ করতে পেরে তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিস চাপ দিচ্ছে তাইওয়ানিজ টংকে, বলছে দুরন্ত ঈগলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরার, কাজেই তাঁকে ছাড়া চলবে না ওই পরাশক্তির।

তাইওয়ানিজ টং চাপ দিচ্ছে থাই টংকে, বলছে, থাই থান্ডারের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে যত তাড়াতাড়ি পার ডক্টর নাদিরাকে উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দাও।

এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে থাই থান্ডারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে থাই টং-এর লিডার জিকো তানাই। এই মুহূর্তে নিজ আস্তানা ব্যান সপ দুর্গে থাই থান্ডারের লিডার চক্রি চুয়ানের প্রতিনিধি, তার বান্ধবী চিত্রলেখা মাহিদল-এর সঙ্গে মিটিং করছে সে।

*

করিডরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। লাবণীকে ইঙ্গিত করল রানা, খোলা খিলানের সামনে থেকে সরে এসে ব্যস্ততার ভান করে হাঁটতে শুরু করল দুজন যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে। একটু পর দেখল বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে ওদের মতই পোশাক পরা দুজন কুলি, তবে তাদের মাথায় দুটো বাক্স রয়েছে। রানার মনে পড়ল, কার্গো শিপের হোল্ডে পরীক্ষা করবার সময় কিছু বাক্সে তরি-তরকারি ও ফলপাকড় দেখেছিল ওরা। সেগুলোই সম্ভবত দুর্গের অন্দরমহলে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

লোকগুলো আরেক বাঁক ঘুরে চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার খোলা খিলানের পাশে ফিরে এল ওরা। এই খিলানের ভিতরই থাই টং লিডার জিকো তানাইয়ের সঙ্গে জরুরি মিটিং করছে থাই থান্ডারের প্রতিনিধি চিত্রলেখা মাহিদল।

রানাকে কাভার দিচ্ছে লাবণী, খিলানের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে কামরার ভিতর তাকাল রানা। দরজার দিকে পাশ ফিরে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে রয়েছে সুন্দরী থাই তরুণী চিত্রলেখা মাহিদল, সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা। লাল স্কার্টের সঙ্গে সাদা পপলিনের টি-শার্ট দারুণ মানিয়েছে মেয়েটিকে, তার উপর পরা খাটো মিঙ্ক কোট অত্যন্ত দামি। বিরাট হাতব্যাগটা রয়েছে কোলের উপর। শিরদাঁড়া খাড়া করে

বসে আছে সে, কথা বলবার সময় দ্রুতভঙ্গিতে হাত নাড়ছে।

চিত্রলেখা মাহিদলের সামনের একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে রয়েছে ফুটবল আকৃতির একজন চিনা। তার পা দুটো হাতিকেও লজ্জা দেবে, পুরো মাথা কামানো, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রানা আন্দাজ করল, এই লোকটাই সম্ভবত থাই টং-এর লিডার জিকো তানাই। তার পিছনেও দুজন দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খিলানের দিকে মুখ করে ফেলা ডাবল সোফায় বসে আছে আরও একজন চিনা। লোকটা বিশালদেহী। রাতের বেলাও সানগ্লাস পরেছে। তাকে তাইওয়ানিজ টং-এর লিডার মো পাই বলে মনে হলো রানার। তার পিছনেও দেহরক্ষী রয়েছে, তবে মাত্র একজন।

কামরার ভিতরে থাই টং সদস্য চাই-পাই দেওকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা, যে লোকটা খুন করেছে ইমরুল কায়েসকে।

চিত্রলেখা মাহিদল পুনরাবৃত্তি করছে তার কথা, 'আমি থাই থান্ডারের তরফ থেকে তাইওয়ানিজ টং চিফের কাছে বিচার চাইছি। সবই তো শুনলেন, এবার বলুন থাই টং আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে কিনা...'

'কেউ বললেই তো আর আমি বিচার করতে পারি না,' ডাবল সোফায় বসা তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই বলল। 'দু'পক্ষকেই আগে রাজি হতে হবে, আমার মধ্যস্থতা বা বিচার মানবে তারা।'

'আমি মানব,' বলল চিত্রলেখা। 'আশা করি আপনার রায় পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।'

'আমিও মানব,' বলল থাই টং চিফ জিকো তানাই। 'তবে অনুরোধ থাকবে থাই থান্ডারের অতি লোভের যেন নিন্দা করা হয়।'

খুক করে কেশে তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই বলল, 'সবাইকে আমি শুধু একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই – কাজটা

কিন্তু একটি মহাক্ষমতাশালী পরাশক্তির। এই কাজ যার কারণেই ব্যর্থ হোক, ওরা কিন্তু আমাদের সবাইকে কঠিন শাস্তি দেবে।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ, আমিও বলি, থাই থান্ডার দ্বিতীয় দফায় বিশ মিলিয়ন ডলার দাবি করে অন্যায় করেছিল। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বলি, এটাই তো আমাদের পেশা – কারও দুর্বলতাকে পুঁজি করে যত পারা যায় কামিয়ে নেয়া। আফটার অল, আসল কাজটা তো ওরাই করেছে, তাই না? থাই টং তো মাঝখান থেকে কমিশন খাচ্ছিল কেবল।

'তারপরেও সবকিছুরই একটা সীমা আছে, এবং সেই সীমা থাই থান্ডার লঙ্ঘন করে গেছে। আমার বিবেচনা বিশ মিলিয়ন ডলার অযৌক্তিক দাবি, আবার বিশ হাজারও ফালতু প্রস্তাব। টাকার অঙ্কটা হওয়া উচিত পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

কামরার ভিতর নীরবতা নেমে এল।

ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড পর তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই আবার মুখ খুলল, 'আমরা তা হলে এই সমঝোতায় পৌঁছালাম যে টাকা-পয়সার লেনদেন চেকের মাধ্যমে নয়, নগদে হবে। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে যেহেতু সিঙ্গাপুরে লুকিয়ে রেখেছে থাই থান্ডার, সেখানেই টাকার বিনিময়ে তাঁকে গ্রহণ করবে থাই টং।'

'চিত্রলেখা বলুন,' মুখ খুলল থাই টং চিফ জিকো, 'বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে সিঙ্গাপুরের কোথায় রাখা হয়েছে, এবং টাকাটা আমরা কোথায় পৌঁছে দেব।'

মাথা নাড়ল চিত্রলেখা। 'কথা দিয়ে সেটা রাখা হয়নি,' বলল সে।

'কথা তো আপনারাও রাখেননি,' পাল্টা জবাব।

'কাজেই একটা অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আমরা আপনাদের সিঙ্গাপুরি আস্তানায় তিলসুলানন্দকে পাঠাব, আপনারা তার হাতে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। পথে তার বা টাকার কিছু হলে, আপনারা দায়ী থাকবেন। টাকা বুঝে পাবার পর ফোনে একটা

ঠিকানা জানাব আমরা, সেখানে গেলে ডক্টর নাদিরাকে পেয়ে যাবেন...'

'এই! কে ওখানে!' অকস্মাৎ হুংকার ছাড়ল জিকো তানাইয়ের একজন দেহরক্ষী, সরাসরি খিলানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

করিডরে কেউ নেই দেখে রানার কাঁধের উপর দিয়ে খিলানের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছিল লাবণী, নিশ্চয়ই দেহরক্ষীর চোখে ধরা পড়ে গেছে।

'সর্বনাশ!' বলে লাবণীর হাত ধরে ছুটল রানা, তবে যেদিক থেকে দুর্গের ভিতর ঢুকেছে সেদিকে নয়, আরও ভিতর দিকে।

ভাগ্যটা ওদের ভালই বলতে হবে যে মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় কী দেখেছে নিজেও নিশ্চিত ছিল না জিকো তানাইয়ের দেহরক্ষী। হুংকার ছাড়লেও কেউ সাড়া না দেওয়ায় ভাবল, নিশ্চয়ই ছায়া দেখেছে সে।

সামনের বাঁকটা ঘুরে হাঁটার গতি কমিয়ে আনল রানা। ওর পাশেই থাকছে লাবণী। ফিসফিস করে জানতে চাইল সে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'তোমার ধারণা সত্যি কি না জানতে,' বলল রানা। 'তুমি বলেছ প্লেনটা এখানে কোথাও আছে।'

সামনের একটা কামরা থেকে সেই দুজন কুলিকে বেরুতে দেখল ওরা, এখন তাদের মাথায় বাক্স নেই। ওদেরকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখল তারা, তবে কিছু বলল না, পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

তারা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হতেই খোলা দরজা দিয়ে কামরাটার ভিতর ঢুকল রানা, পিছু নিয়ে লাবণীও। এক মিনিট পর বেরিয়ে এল আবার, দুজনের মাথাতেই ছোট আকারের একটা করে কাঠের বাক্স। এই অবস্থায় দেখলে সহজে কেউ ওদেরকে সন্দেহ করতে পারবে না।

আরও তিনটে বন্ধ কামরার দরজা ও দুটো খোলা খিলানকে

পাশ কাটাল ওরা। করিডরের চৌমাথায় পৌঁছে কোন্ দিকে যাবে ভাবছে রানা, একটা গুঞ্জন শুনতে পেয়ে ডান দিকে রওনা হলো। কিছু দূর যাওয়ার পর সামনে পড়ল বিরাট হলরুম, এক মাথায় নীচে নামবার সিঁড়ি, আরেক মাথায় উপরে ওঠার। গুঞ্জনটা ভেসে আসছে নীচে থেকে।

লাবণীকে পিছু নেওয়ার ইঙ্গিত করল রানা। ধাপ বেয়ে নামছে ওরা। খানিকটা নেমে মোচড় খেয়েছে সিঁড়িটা। ধাপগুলো কংক্রিটের। আরেকটা করিডরে নামতে যাচ্ছে, এই সময় রানা দেখল বাম দিক থেকে দুজন লোক হন হন করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিছু হটে সিঁড়ির ধাপে ফিরতে গিয়ে আরেকটু হলে লাবণীকে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল ও।

মাথায় বাক্স নিয়ে সিঁড়ি ধাপে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। পায়ের আওয়াজ দ্রুত এগিয়ে আসছে। চিনা ভাষায় কথা বলছে উত্তেজিত লোক দুজন, কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। সিঁড়িকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল তারা, ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল না। রানার বাহুতে নিজের গালটা বারবার ঘষছে লাবণী, বিড়াল যেমন গা ঘষে মানুষের পায়ে।

ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাল রানা।

নিঃশব্দে হাসল লাবণী। 'চুলকাচ্ছিল।'

সিঁড়ি থেকে নেমে এসে করিডরের দু'দিকে তাকাল ওরা। কেউ নেই। বাম দিকে এগোল, আরেক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে আরও এক ফ্লোর নীচে নামল। এই সিঁড়িটা শেষ হয়েছে একটা দরজার সামনে। হাত দিতেই খুলে গেল কবাট, লাবণীকে নিয়ে একটা টানেলে ঢুকল রানা।

টানেলে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। দেয়াল বরাবর বিশ ফুট পরপর একটা করে ছোট আকারের স্পিকার ফিট করা। লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। টানেলটা বাম দিকে প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে অলসভঙ্গিতে বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। খানিক পর পর

দেয়ালের গা পিছিয়ে গেছে, ওখানে একটা করে কুলঙ্গি।

মাথায় বোঝা নিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটতে ইতিমধ্যে দুজনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, হাত দিয়ে ধরে না থাকা সত্ত্বেও গামছা বসানো খুলি থেকে বাক্সটার পড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই।

পা চালিয়ে এগোল ওরা, দেয়াল ঘেঁষে হাঁটছে। ধনুক আকৃতির বাঁকের কাছে আসবার পর হাঁটার গতি কমিয়ে আনল। ওদের সামনে প্রকাণ্ড আকারের দুটো সুইং ডোর – আসলে ফটক। একেকটা পঞ্চাশ ফুট উঁচু, চওড়ায় তার দ্বিগুণ। ওগুলোর পিছন থেকে ভোঁতা একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

লাবণীকে নিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এল রানা, একটা কুলঙ্গির ভিতর দিকে সরে এসে মাথার বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। 'এখানে অপেক্ষা করো, আমি চেক করে আসি,' বলল ও।

ওর দেখাদেখি নিজের বাক্সটাও নামিয়েছে লাবণী। মাথা ঝাঁকিয়ে নার্ভাস একটু হাসল সে।

বাঁকটা পুরো ঘুরে এগোল রানা, লক্ষ করল ফটক দুটোর গায়ে স্বাভাবিক আকৃতির একটা করে দরজাও আছে। বাম দিকের দরজাটা খোলার জন্য নব-এর দিকে হাত বাড়াতে যাবে ও, এই সময় নিজে থেকেই খুলে গেল সেটা।

হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক লোক, প্রকাণ্ড মুখটা ঘামে ভিজে আছে। গায়ের রঙ হলুদ, চোখ দুটো সরু ফাটল মাত্র। পরনে সাদা সুট, বুকের কাছে লাল গোলাপ আটকানো। দেখা মাত্র চিনল রানা, সঙ্গে সঙ্গে হাতে বেরিয়ে এল ছুরিটা।

রানাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল চাই-পাই দেও।

কল্পনার চোখে ইমরুল কায়েসের প্রাণবন্ত চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে রানা। দেওয়ের হাত শার্টের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। ছুরির সরু ফলাটা তরোয়ালের মত সোজা ঢুকিয়ে দিল রানা তার বুকে, ফলার ডগা দিয়ে চিরে দিল হৃৎপিণ্ডটাকে। আরেকটু ঠেলে হাতল

পর্যন্ত ঢোকাল ও। তারপর পিছিয়ে এসে ছুরিটা টান দিয়ে বের করে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ের শার্টের সামনেটা লাল হয়ে উঠল, সুটে বাটনহোলে আটকানো ওই একই রঙের গোলাপটাও ঠিক এই সময় টুপ করে পড়ে গেল করিডরের মেঝেতে। এক পা পিছু হটল থাই চিনা। মুক্তোখচিত হাতলসহ ছোট্ট পিস্তলটাও শার্টের ভিতর থেকে খসে পড়ল। ঘুরে রানার দিকে পিছন ফিরল চাই-পাই দেও, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু নেই তার।

ছুরির ফলা মুছে মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গিয়ে বড় একটা কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রাখল রানা, তারপর ফিরে এসে দরজাটা খুলল। কামরার ভিতর হালকা ধোঁয়া রয়েছে। ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে ছুটোছুটি করছে লোকজন।

কামরাটা বিরাট, বড় আকারের ইনডোর স্টেডিয়ামের মত। স্টেডিয়ামের মাঝখানে বড়সড় একটা কাঠামো দেখতে পাচ্ছে রানা, তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেটাকে। তেরপলের গায়ে কাঠামোটার ফুটে ওঠা আকৃতি দেখে রানার আর বুঝতে বাকি থাকল না কী ওটা।

একটা প্লেন।

দশ-বারোজন লোক তেরপলের উপর সাদা ফোম স্প্রে করছে। একই সঙ্গে একটা টো কার তেরপল দিয়ে ঢাকা প্লেনটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আরেকদিকে, ওটার পিছু নিয়ে এগোচ্ছে কমকরেও পঞ্চাশ-ষাটজন চিনা। তাদের সঙ্গে পাঁচ-সাতজন শ্বেতাঙ্গকেও দেখল রানা, চেহারায় বয়স ও ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখে মনে হলো পাইলট কিংবা অ্যারোনটিক ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে।

তেরপলে ঢাকা থাকায় বোঝার কোনও উপায় নেই যে ওটা বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের জেট দুরন্ত ঈগল কি না। কামরার

ভিতরে কোথাও আগুনের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে রানা। ওর মত কুলি আর কেউ নেই ভিতরে, তারপরেও সাহস করে ভিড় ঠেলে এগোল রানা, কাছ থেকে দেখে যদি কিছু বুঝতে পারে এই আশায়। প্লেনটাকে পুরো এক চক্কর ঘুরে আসতে দশ-বারো মিনিট লেগে গেল, কিন্তু রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারল না ও।

তেরপলের কোণ ধরে তুলতে পারলে ভিতরটা দেখা যায়, কিন্তু তাতে নিজের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হবে। তা ছাড়া, চিনারা এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, ওটার পাঁচ ফুটের মধ্যেও পৌঁছাতে পারছে না রানা।

রানার ইচ্ছে দৃশ্যটা লাবণীও দেখুক। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে, স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে বাঁকের দিকে এগোচ্ছে ও।

এই সময় লাউডস্পিকার থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। 'অ্যাটেনশন এভরিবডি! অ্যাটেনশন! একটি বিশেষ ঘোষণা। আমাদের আস্তানায় শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে! ধারণা করা হচ্ছে সংখ্যায় তারা কয়েকজন। দুর্গের সমস্ত জানালা-দরজা ও ফটক বন্ধ করে দাও। রিজার্ভ গার্ডরা ডিউটিতে চলে এসো! সবাই খেয়াল রাখো কোনও অবস্থাতেই তারা যেন দুর্গ থেকে বেরুতে না পারে।'

হনহন করে এগোচ্ছে রানা। বাঁকটার কাছে ফিরে এসে কুলঙ্গিতে ঢুকল। তারপর স্থির হয়ে গেল ও। শুধু বাক্স দুটো রয়েছে, লাবণী নেই – না কুলঙ্গিতে, না টানেলে।

এগারো

দুর্গে শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে শুনে স্টেনগান ও কারবাইন হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ফটকের দরজা দিয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে এল থাই টং-এর রিজার্ভ গার্ডরা। বাঁক ঘুরে সিঁড়ির দিকে ছুটছে তারা, তাদের সঙ্গে রানাও ছুটছে।

সিঁড়ির অর্ধেকটা নির্বিঘ্নে নেমে এল রানা। তারপর গার্ডদের উল্টো একটা স্রোতের মুখে পড়তে হলো। একে তো কিছু লোক নামছে, কিছু লোক উঠছে, তার উপর কেউ কাউকে পথ ছাড়তে রাজি নয়। ফাঁক গলে কোনওরকমে নীচে নামতে পারল রানা।

করিডরের অবস্থা আরও খারাপ। জনস্রোতের দুটো ধারা এখানেও পরস্পরের উল্টোদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দুই স্রোতের মাঝখানে আটকা পড়ে নিজেকে যখন নিরাপদ বলে ভাবতে শুরু করেছে রানা, ঠিক তখনই ছয় ফুট লম্বা এক শ্বেতাঙ্গ অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে নাকি মার্কিনী উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, 'যেন চেনা চেনা লাগে?'

কিছু বুঝতে না পারার ভান করে সোজা সামনে তাকিয়ে লোকটাকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল রানা।

পরমুহূর্তে হিংস্র উল্লাসে হেসে উঠল শ্বেতাঙ্গ লোকটা। 'ওহ্ গড, হাউ ফানি অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং! তুমিই তা হলে অনুপ্রবেশ করেছ – মাসুদ রা...'

চিনাদের হইচইকে ছাপিয়ে গুলির শব্দ হলো। রানার হাতে বেরিয়ে আসা পিস্তল থেকে হয়েছে গুলিটা। শ্বেতাঙ্গ লোকটা কল্পনাও করতে পারেনি এত শত্রুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক গুলি চালাবে রানা।

ব্যথায় ও বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল এসপিওনাজ এজেন্ট, হাত

চাপা দিল ঠিক যেখানে তার হৃৎপিণ্ডটা ফুটো হয়েছে। চোখ নামিয়ে তাকাল সে, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত বেরিয়ে আসছে। তারপর নিস্তেজ হয়ে গেল তার চোখ দুটো। মারা গেছে, কিন্তু জায়গার অভাবে লাশটা পড়ছে না।

আশপাশের চিনা গার্ডরা অনেকেই এখন তাকিয়ে আছে রানার দিকে। নিজেদের মাঝখানে শত্রুকে পেয়েও কী করবে বুঝতে পারছে না তারা। পরস্পরের সঙ্গে চিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে সবাই, কেউই তার আগ্নেয়াস্ত্র কায়দা মত ধরতে পারছে না। নিজের পথ করে নেওয়ার জন্য ডান হাতে ধরা পিস্তলের ট্রিগার আরেকবার টিপে দিল রানা। এক লোকের একটা হাত ওর গলার দিকে এগিয়ে আসছিল, নেতিয়ে পড়ল সেটা।

প্রচণ্ড চাপের মধ্যে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা সবাই, তারই সুযোগ নিচ্ছে রানা। এক গার্ড তার পিস্তল বের করবার চেষ্টা করছে, দেখতে পেয়েই ব্যারেল ঘুরিয়ে আবার ট্রিগার টিপল ও। গুলি খেয়ে উল্টে গেল তার চোখ।

বুকে ও কাঁধে ঘুসি অনুভব করল রানা, ঝাঁকি খাচ্ছে ওর শরীর। চারপাশ থেকে আঘাত আসছে। এখন শুধু একটু ফাঁকা জায়গা দরকার ওদের, চারদিক থেকে ওকে ধরে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে থাই চিনারা।

দুজন গার্ড এভাবে সুবিধে হবে না বুঝে দ্রুত পিছিয়ে গেল কিছুদূর। পিছাবার জায়গা পেতে তেমন কোনও অসুবিধে হলো না। প্রথম সুযোগেই রানার বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তুলতে যাচ্ছে দুজন একযোগে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেয়ে কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টিপল রানা। একবার, তারপর আরেকবার।

তাড়াহুড়ো করায় ঠিকমত লক্ষ্যস্থির করা হয়নি। দুটো বুলেটই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। থেমে নেই ও, ট্রিগারটা বারবার টিপছে। আরও দুটো বুলেট বেরুবার পর ক্লিক করে উঠল পিস্তল, ম্যাগাজিন

খালি হয়ে গেছে।

একজনের আর্তনাদ শুনতে পেল রানা, ফোঁপাচ্ছে আরেকজন। দুজনেই তারা যে যার কাঁধে রাইফেল তুলে ফেলেছিল, একজনের খুলির একটা পাশ উড়িয়ে দিয়েছে ও, আরেকজনের বুকের বাম পাশ ফুটো হয়ে গেছে। তবে সেই সঙ্গে নিজের মৃত্যুও বুঝি ডেকে এনেছে রানা।

পিস্তলে গুলি নেই বুঝতে পেরে থাই চিনারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে ওকে। উল্টো করে ধরা পিস্তলটা নিজের চারপাশে এলোপাথাড়ি চালাচ্ছে রানা, কারও মাথা, কারও কপাল বা নাক লক্ষ্য করে, নাগালের মধ্যে যেটা পাওয়া যায়।

নিচু হলো এক লোক, রানার একটা পা জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। এক লোকের শার্টের সামনেটা খামচে ধরল রানা, ঠেলে দিল ওর দিকে তাক করা একটা রাইফেলের মাজল লক্ষ্য করে। বদ্ধ করিডরে বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো। কোনওদিকে খেয়াল নেই রানার, বিদ্যুৎ বেগে পা চালিয়ে নিজেকে মুক্ত করে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

তিনজন চিনা পিছু নিল ওর। ছয়টা ধাপ ওঠার পর ঘুরল রানা, সামনের লোকটার মুখে লাথি মারল। বাকি দুজনের উপর আছাড় খেল সে, তিনজনই ছিটকে পড়ল করিডরে। এই সুযোগে দ্রুত হাতে খালি ম্যাগাজিনটা পিস্তল থেকে বের করে ফেলল রানা, তারপর ওয়েস্টব্যান্ড থেকে টেনে নিয়ে এক্সট্রা ক্লিপটা ভরল। স্লাইড রিলিজে চাপ দিতেই সড়াৎ করে বুলেট ঢুকল চেম্বারে। আবার তৈরি রানা।

দুটো করে ধাপ টপকে উপরের খালি করিডরে উঠে এল রানা। চৌমাথায় পৌঁছেও কারও সঙ্গে দেখা হলো না ওর। দূর থেকে দেখে নির্দিষ্ট খিলানটা চিনতে পারল, মাথায় ড্রাগনের মূর্তি ঝুলছে। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না আর।

খিলানের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, মোমবাতির আলোয় দেখল সোফাগুলো সব খালি। শেষ মাথার একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রকাণ্ডদেহী এক লোক, তার কাঁধে দু-ভাঁজ হয়ে পড়ে রয়েছে নোংরা জিনস্ ও ফতুয়া পরা লাবণী। কোনও রকম ধস্তাধস্তি করছে না দেখে রানা ধরে নিল লাবণীর জ্ঞান নেই।

প্রকাণ্ডদেহী লোকটার চোখে সানগ্লাস রয়েছে বলে মনে হলো রানার। এই লোকটাই সম্ভবত তাইওয়ানিজ টং-এর লিডার মো পাই। পিছু নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তার দেহরক্ষীও।

'এই, দাঁড়াও!' দু-হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল, কামরার ভিতর ঢুকে বন্ধ হতে শুরু করা দরজার দিকে ছুটল রানা। ওর নির্দেশের পিছু নিয়ে ছুটল দুটো বুলেটও।

কোথায় লাগল বোঝা না গেলেও, দেহরক্ষীর গলা থেকে বেরিয়ে আসা কাতর আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। কিন্তু তারপরও কবাট লাগিয়ে লক করে দিল সে।

ছুটে এসে কপাটে লাথি মারল রানা। খুলল না। রাগে ও উদ্বেগে দিশেহারা বোধ করছে, তিন পা পিছিয়ে এসে নব লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল। মুঠো ঢোকার মত একটা গর্ত তৈরি হলো। না ছুঁতেই একটু খুলে গেল কবাট।

টান দিয়ে সবটুকু খুলল রানা। উপরদিকে উঠে গেছে পাকা এক প্রস্থ সিঁড়ি। সামনেই কয়েকটা রক্তাক্ত ধাপের উপর পড়ে রয়েছে দেহরক্ষী। মারা গেছে কি না দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা।

দুটো করে ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছে ও, কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে প্রকাণ্ডদেহী মো পাইয়ের কাঁধে অসাড় পড়ে রয়েছে লাবণী। পায়ের নীচে দ্রুতগামী এস্কেলেটর-এর মত পিছিয়ে যাচ্ছে ধাপগুলো, স্পর্শ করছে কি না ধরা পড়ছে না চেতনায়।

একের পর এক কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি পার হয়ে এল রানা, তবু এর যেন কোনও শেষ নেই। হাঁপাতে শুরু করেছে ও। ফুসফুস

ব্যথা করছে। পিস্তলটা দীর্ঘক্ষণ শক্ত করে ধরে থাকায় ডান হাতটা আড়ষ্ট লাগছে। তারপর হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল সিঁড়ির ধাপ।

সামনে আরেক দরজা! ওটার ওপাশ থেকে বাতাস কাটার আওয়াজ ভেসে আসছে। বেশ জোরাল আওয়াজ, যান্ত্রিক বলে মনে হলো।

রানার হাতে ঝাঁকি খেল পিস্তল। একটা গুলিই যথেষ্ট। ডোর নব উড়ে গেল, পাশে তৈরি হলো একটা গর্ত। সেটার ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে পিতলের বোল্ট খুলতে কোনও সমস্যা হলো না। লাথি মেরে কবাটটা খুলল রানা।

দুর্গের ছাদে তুফান বইছে। বাতাসের চাপে কাপড়চোপড় সেঁটে যাচ্ছে গায়ে। ছাদে বেরুবার সময় বাতাসের সঙ্গে ছুটে আসা বালির কণার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে রানাকে। তবে হেলিকপ্টার ইঞ্জিনের আওয়াজ বাকি সব শব্দকে চাপা ফেলে দিচ্ছে।

দ্রুত ঘুরছে রোটর ব্লেড। নীচে থেকে দুর্গের ছাদে এই হেলিকপ্টারটাই দেখেছিল রানা। রঙটা কালো, কোথাও কোনও মার্কিং নেই। ছাদের মেঝে থেকে শূন্যে উঠতে শুরু করল ওটা, গোটা কাঠামো থরথর করে কাঁপছে।

মাথা নিচু করে ওটার একটা পাশ লক্ষ্য করে এগোচ্ছে রানা। প্রকাণ্ড বুদ্বুদ আকারের কন্ট্রোল কেবিন লক্ষ্য করে পর পর তিনটে গুলি করল ও। গুলির শব্দ পায়নি, তবে ফাইবার গ্লাস গম্বুজে গর্ত তৈরি হতে দেখল। চেম্বার খালি হয়ে গেছে, দ্রুত হাতে আরেকটা স্পেয়ার ক্লিপ ভরল রানা। এটাই শেষ, আর নেই।

আরও জোরে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কপ্টারের হুইল ছাদ ছেড়ে উঠে পড়ল। প্রকাণ্ড ব্লেডগুলোর জন্য সামনে এগোতে ভয় পাচ্ছে রানা, মেঝেতে একটা হাঁটু গাড়তে বাধ্য হলো। ছাদে কোথাও বালির স্তূপ আছে, বাতাসের সঙ্গে উড়ে এসে চোখে-মুখে সুইয়ের মত বিঁধছে কণাগুলো।

কপ্টার অচল হয়ে যাবে, তাই ইঞ্জিনে গুলি করতে ভয় পাচ্ছে রানা। রানার দাঁতে লেগে কিচকিচ করছে বালির কণা। পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করে আবার ফায়ার শুরু করল ও। কন্ট্রোল কেবিনের ফাইবার গ্লাসে আরও তিন-চারটে গর্ত তৈরি হলো। কানের পরদা ফাটানোর মত আওয়াজ করছে ইঞ্জিনটা। মেঝে থেকে পাঁচ-ছ'হাত উপরে উঠে গেল হুইল। তারপর আবার নামতে শুরু করল।

হঠাৎ প্যাসেঞ্জার কেবিনের দরজা খুলে গেল, ভিতর থেকে গড়িয়ে নেমে এল লাবণীর অসাড় শরীর।

ওকে খুন করে লাশটা ফেলে দিল মো পাই, অন্তত প্রথমে তাই ভাবল রানা। তারপর দেখল নড়ছে লাবণী, ধীরে ধীরে সরে আসবার চেষ্টা করছে কপ্টারের নীচ থেকে।

মাথা নিচু করে ছুটল রানা, কারণ নিয়ন্ত্রণহীন কপ্টার সরাসরি লাবণীর উপর নেমে আসছে।

ক্রল করে নিজেই খানিকটা সরে এল লাবণী, তারপর রানা তাকে টেনে নিরপদ দূরত্বে সরিয়ে আনল। ওদের কাছ থেকে তিন কি চার হাত দূরে মেঝেতে নামল মস্ত যান্ত্রিক ফড়িংটা।

'তোমার গুলি খেয়ে মারা গেছে মো পাই,' রানার কানের কাছে ঠোঁট তুলে বলল লাবণী। 'লাশটা কন্ট্রোল কেবিন থেকে সরাতে হবে।'

মাথা নিচু করে প্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে কপ্টারে ঢুকল রানা। হাত বাড়িয়ে উপরে উঠতে সাহায্য করল লাবণীকে। লাবণী দরজা বন্ধ করছে, সিট টপকে ফুটো হওয়া গম্বুজে ঢুকল ও।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে নিজের সিটের উপর কাত হয়ে আছে মো পাই, গলায় বিরাট একটা রক্তাক্ত ক্ষত। পায়ের ধাক্কায় সিট থেকে তাকে নামাল রানা, তার জায়গায় বসে কন্ট্রোল প্যানেলে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে।

কপ্টার উঠতে শুরু করেছে, ওর পাশে এসে দাঁড়াল লাবণী।

গম্বুজের ঢাকনিটা তুলল সে, তারপর ভারী লাশটা ঠেলে-ঠুলে কিনারা থেকে ফেলে দিল দুর্গের ছাদে, এখন সেটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে দশ ফুট নীচে।

গম্বুজের ঢাকনি বন্ধ করে রানার পিছনের সিটে বসল লাবণী, একটা হাত বাড়িয়ে ওর মাথা থেকে গামছাটা খুলে নিল, চুলের ভিতর আঙুল চালাচ্ছে।

'দুর্গে একটা প্লেন দেখলাম, তেরপল ও ফোমে ঢাকা,' বলল রানা। 'তবে সেটা দুরন্ত ঈগল কি না জানি না।' তারপর জানতে চাইল, 'করিডরে বেরিয়ে কুলঙ্গিতে তোমাকে পেলাম না কেন?'

'কয়েকজন গার্ড আমাকে দেখে ফেলে,' বলল লাবণী। 'পিস্তল হাতেই ছিল, কিন্তু অতগুলো লোককে মেরে ফেলা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সারেন্ডার করি আমি। আমার পিস্তল, ছুরি আর মাথার গামছা কেড়ে নেয় ওরা, তারপর সোজা জিকো তানাইয়ের কাছে নিয়ে হাজির করে আমাকে।'

'ওরা তোমার ওপর টরচার করেছে?'

'বলছি। ওখানে ওদের মিটিং মাত্র শেষ হয়েছে তখন। কথা শুনে বুঝলাম চিত্রলেখাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে ওঠার জন্যে রওনা হবে জিকো। হঠাৎ কী হলো, আমাকে দেখেই চিত্রলেখা একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠল। বলল – এই ডাইনীকে আমি চিনি! রানা এজেন্সির অপারেটর! বছরে থাই থান্ডারের পাঁচ-সাতটা চালান ধরে ফেলছে ওরা, তাতে আমাদের বিশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে! ওকে আমি খুন করব!'

'খোদা!' দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল রানা।

দুজন গার্ড দু'দিক থেকে ধরে রেখেছে আমাকে,' বলল লাবণী। 'চিত্রলেখা কারাতের কোপ মারার ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, খুনের নেশায় পেয়েছে তাকে। কোত্থেকে শক্তি পেলাম জানি না, প্রচণ্ড এক ঝটকায় গার্ডদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম,

তারপর ফ্লাইং কিক মারলাম চিত্রলেখার বুকে।

'কী কারণে সে মারা যায়নি, আমি বলতে পারব না। জিকো তার পিস্তলের বাঁট দিয়ে আমার মাথার পেছনে বাড়ি মারতে মেঝেতে পড়ে যাই আমি। তবে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইনি।'

'কী দেখলে?'

'দূরে ছিটকে পড়ার পর কয়েক সেকেন্ড নড়ল না চিত্রলেখা। অনেকেই ছুটে গেল তার দিকে। তারপর দেখলাম নিজেই ধীরে ধীরে দাঁড়াচ্ছে সে। এই সময় তাইওয়ানিজ টং চিফ মো পাই বলল, 'ব্রাদার জিকো, আপনি অনুমতি দিলে রানা এজেন্সির এই অপারেটরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই আমি। কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় কিছুই তো বলা যায় না, ওকে আমাদের কাজে লাগতে পারে। জিকো রাজি হলো। আর ঠিক তখনই টেলিফোনে খারাপ কিছু রিপোর্ট পেল সে। শুনলাম লাউডস্পিকারে কী যেন ঘোষণা করছে। শুনতে পাইনি, কারণ তখনই আমি জ্ঞান হারাই।'

'ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ,' লাবণীর কথা শেষ হতে বলল রানা। 'তোমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল মো?'

'ঠিক জানি না, সম্ভবত সিঙ্গাপুরে।'

'সহকারী দেও মারা গেছে, কাজেই থাই থান্ডারকে টাকা দিয়ে ডক্টর নাদিরাকে হাতে পাবার জন্যে জিকোকেই যেতে হবে সিঙ্গাপুরে। চিত্রলেখাও সেখানে ফিরবে, তার বয়ফ্রেন্ড চক্রি চুয়ানকে রিপোর্ট করার জন্যে।'

'আমরাও নিশ্চয়ই ব্যাংকক হয়ে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি, মাসুদ ভাই?' খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল লাবণী, বিপজ্জনক ও রোমাঞ্চকর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াতে ওদের পেশার কার না ভাল লাগে।

'না, লাবণী, এখানে তোমার কাজ আছে,' বলল রানা, ফুয়েল গজের উপর চোখ। 'আমরা ব্যাংকক এয়ারপোর্টে নামার পর তুমি একা শেরাটন হোটেলে ফিরবে। নিজের স্যুইটে ঘণ্টা

কয়েক ঘুমাবে, তারপর দুজনের বিল মেটাবে, দুটো স্যুইট থেকে জিনিস-পত্র নিয়ে হেলিকপ্টার সার্ভিসে চড়ে ফিরে যাবে হাট খোয়াইয়ে।'

'ওখানে আমার কাজ কী, মাসুদ ভাই?' সিরিয়াস হয়ে উঠল লাবণী।

'নন্দনকাননেই উঠবে তুমি,' নির্দেশ দিল রানা। 'তোমার আসল কাজ প্লেনটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা। তা ছাড়া, দুর্গে কারা আসা-যাওয়া করছে...'

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল লাবণী। 'আর তুমি?'

'এয়ারপোর্ট লকারে আমার পাসপোর্ট ও ক্রেডিট কার্ড আছে, ভিসা নিয়ে ওখান থেকেই সিঙ্গাপুরে চলে যাব আমি – টার্মিনাল বিল্ডিঙের কোনও দোকান থেকে পরার মত কিছু কিনে নেব।'

পুবদিকের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে দেখে হঠাৎ লাবণী জানতে চাইল, 'কিন্তু তুমি ঘুমাবে না?'

'সিঙ্গাপুরে পৌঁছে,' বলল রানা। 'ব্যাংকক থেকে কাছেই তো।'

'পাঁচ মিলিয়ন ডলার হাতে পেলে থাই থান্ডার ডক্টর নাদিরাকে থাই টঙের হাতে তুলে দেবে,' বলল লাবণী। 'কিন্তু আমরা কি কোনও সূত্র পেয়েছি, বিনিময়টা সিঙ্গাপুরের কোথায় হবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা না জানলেও, চক্রি চুয়ানের ক্যাসিনোর নাম জানি, বিগ ডিল। ওটা আয়ার রাজা রোডে। আরও জানি যে টাকাটা আনতে যাবে থাই থান্ডারের প্রতিনিধি প্রেম তিলসুলানন্দ।'

দোই ইনথানন পাহাড়ে পরিচয়, উত্তরা উৎকর্ণার কথা মনে পড়ে গেল রানার। মেয়েটি ওকে বেশ কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে – সাহায্য করেছে, নাকি ফাঁদে ফেলার আয়োজন করে রেখেছে?

বারো

সিঙ্গাপুর। আয়ার রাজা রোড।

সন্ধ্যার পর উৎসবে-আনন্দে মেতে উঠেছে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা, সারাদিন ফাইভ স্টার হোটেল স্যুইটে ঘুমিয়ে নিয়ে আলগোছে তাদের ভিড়ে মিশে গেল রানাও। গোটা এলাকায় নাইট ক্লাব, ক্যাসিনো ও ম্যাসাজ পারলার-এর ছড়াছড়ি।

সামনেই নিওনসাইন জ্বলছে-নিভছে, ক্যাসিনো বিগ ডিল। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে রানা। বাতাসে মৌ-মৌ করছে পারফিউম-এর মিষ্টি গন্ধ, তার সঙ্গে মিশে আছে ঘাম ও বিয়ারের ঝাঁঝ।

ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছে কয়েকজন তরুণ-তরুণী, তাদের উচ্ছ্বাসভরা আলাপ ও হাসি অনেকেরই দৃষ্টি কেড়ে নিল। হঠাৎ করে পরনের সুটে অপ্রত্যাশিত খসখসে কিছু অনুভব করল রানা।

ঝট করে একটা হাত ছুঁড়ল ও। এই মাত্র ওর পকেট মার হয়ে গেছে।

ওর মুঠোয় একটা কবজি ধরা পড়েছে। সেটাকে মুচড়ে বাঁকা করতে চেষ্টা করছে রানা।

দরজার ঠিক ভিতরে রয়েছে ও, পকেটমারের হাতটার সঙ্গে নিঃশব্দে ওর সামনে চলে এল হাতের মালিকও। সুন্দর একজোড়া চোখ দেখতে পাচ্ছে রানা; বুদ্ধির ঝিলিক ও মার্জিত ভাব, দুটোই

আছে সেগুলোয়, তবে এই মুহূর্তে ব্যথায় ঝাপসা হয়ে আসছে লোকটার দৃষ্টি। হালকা সবুজ রঙের সুট ও বাদামী রঙের টাই পরে আছে সে। রানা ভাবল, এরকম একজন নিপাট ভদ্রলোক পকেটমার?

দরজা দিয়ে প্রচুর ব্যস্ত লোকজন আসা-যাওয়া করছে, ওদের দিকে খেয়াল নেই কারও। নতুন যারা ঢুকছে তাদের কিছু চলে যাচ্ছে রেস্তোরাঁ কিংবা বারের দিকে, কেউ কেউ সরাসরি ক্যাসিনোতে ঢুকে বসে পড়ছে জুয়ার টেবিলে।

'এটা বোধহয় আমার,' বলল রানা। হঠাৎ নেতিয়ে পড়া বাম হাতের আঙুল থেকে নিজের মানিব্যাগটা টেনে নিল ও।

ত্রিশ-বত্রিশ বয়স হবে লোকটার, ছোটখাট কাঠামো। ঘামে ভিজে গেছে কপালটা। তবে অসম্ভব জেদি মানুষ, ব্যথার কাছে হার মানতে রাজি নয়। মুখে এতটুকু ভাঁজ পড়েনি, শ্বাস-প্রশ্বাসও কীভাবে যেন স্বাভাবিক রেখেছে।

'নমস্তে, হুজুর! সেলাম, সার!' পরিষ্কার হিন্দি উচ্চারণ লোকটার। তারপর রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় বলল, 'যাবতীয় অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করে দিতে আজ্ঞা হোক, মহাশয়। এখানে আসলে, বুঝলেন না, নির্ভেজাল একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটেছে। আপনাকে রাজীব মনে করেছিলাম,' কুর্নিশ করবার জন্য পিছিয়ে যাওয়ার ছলে রানার শক্ত মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

'রাজীব গান্ধী?' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল রানা।

'না-না! আমার ফুফাতো ভাই, সার, বুঝলেন না! একদম আপনার চেহারা। আমরা দুজন সব সময় এটা করি। কী যেন বলে... কৌতুক, সার! মানে, কে কাকে বোকা বানাতে পারে আর কী, বুঝলেন না।'

'এখানে কি কোনও সমস্যা হয়েছে, প্লিজ?' রানার পাশে উদয় হলো ক্যাসিনোর একজন বডিবিল্ডার গার্ড। কী কারণে যেন রেগে

আছে সে, কিংবা তার চেহারাটাই অমন।

'সমস্যা? তা বলতে পার, তবে সেটা এমন কঠিন কিছু নয় যে আমরা নিজেরাই সমাধান করে নিতে পারব না,' তাড়াতাড়ি বলল খুদে লোকটা। চট করে রানা ও গার্ডকে দেখে নিল।

'সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝি,' বলল রানা। পকেটমারের কবজি ছেড়ে দিল ও, তারপর হাত তুলে লোকটার কোঁচকানো সুটের কাঁধ থেকে ধুলো ঝেড়ে দিল। 'ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনার জন্যে আমরা এখন বাইরে বেরুব।'

'জে, আজ্ঞে,' ম্লান সুরে বলল লোকটা, কবজিটা ডলছে। কী ভেবে মাথা নাড়ল, আহত হাতটা ধরে আছে। দরজার দিকে না এগিয়ে পিছু হটে ক্যাসিনোর ভিতর দিকে যেতে চাইছে সে।

খপ্ করে তার হাত ধরে দরজার দিকে এগোল রানা। 'আলাপটা আমরা এখনই সেরে নেব,' কর্তৃত্বের সুরে বলল ও, লোকটাকে টেনে বের করে আনল বাইরে।

ক্যাসিনোর ভিতর থেকে ইংলিশ মিউজিকের আওয়াজ ও বডিবিল্ডার থাই গার্ডের স্বস্তিভরা দৃষ্টি অনুসরণ করল ওদেরকে।

'বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমি এক হতদরিদ্র লোক, সার, বুঝলেন না!' ফুটপাথের একধারে স্থির হয়ে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মিনতির সুরে বলল লোকটা।

'আমরা সবাই তাই।' তাকে নিয়ে দালানটার বাঁক ঘুরে সরু গলিতে চলে এল রানা। আলো এখানে খুবই কম, পেচ্ছাবের ঝাঁঝাল দুর্গন্ধ বক্সিং মারল নাকে। ভাঙা কাঁচ ও তোবড়ানো বিয়ারের ক্যানে ভর্তি হয়ে আছে গলিটা।

'বের করো ওটা,' বলল রানা।

'হুজুর!' টান টান হলো ছোটখাট লোকটা, আত্মসম্মানে ঘা লাগায় গোটা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আপনি আপনার মানিব্যাগ ফেরত পেয়েছেন। আমি যথাবিহিত নিয়মে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। নিম্নমানের হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা ছিল স্রেফ একটা

কৌতুক। তবে এ-কথা সত্যি যে আপনি আমার ফুফাতো ভাই রাজীবের মত দেখতে।'

'আমার ঘড়িটা,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ওটা তোমার পকেটে।'

'কী?'

'সেইসঙ্গে আমার টাইপিন ও কাফলিঙ্ক। তোমার জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে।'

'আমি আপনাকে একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, সার...' হতচকিত একটা ভাব দেখিয়ে শুরু করল চোরটা।

দুঃসাহসী লোকটার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ওগুলো তুমি বের করবে, নাকি আমিই বের করে নেব?'

চোখ মিটমিট করে কথাটা বিবেচনা করল পকেটমার। অতি ব্যবহারে নরম হয়ে আসা হালকা সবুজ রঙের সুট পরে আছে সে। সাদা শার্টটা খুব বেশি ঢোলা, রানা সন্দেহ করল নিশ্চয়ই কোনও দোকান থেকে মেরে দেওয়া। বাদামি রঙের টাইটাও সুটের মত পুরানো। কপালটা এখনও ঘামছে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছল সেটা।

নিঃশব্দে জ্যাকেটের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে রানার হাতঘড়ি, টাই পিন ও কাফ লিঙ্কটা বের করে আনল সে। সবই রানার বলা পকেট থেকে। তালুতে রাখা জিনিসগুলোর দিকে এক মুহূর্ত মন খারাপ করে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ঘড়িটা কবজিতে পরল রানা। সোনার লিঙ্ক জায়গামত আটকাল। সবশেষে টাইয়ে গাঁথল হীরে বসানো স্টিকপিনটা।

'আমি কিন্তু খুব কমই ধরা পড়ি, সার,' বলল পকেটমার, এখনও হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। মুখটা তার চওড়া, চিবুকে খানিকটা দাড়ি আছে, নাকটা ভাঙা।

'পেশাটা বদলে ফেলতে পার,' সাজেশন দিল রানা।

ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, অপমানিত বোধ করছে। তার মাথার চাঁদি রানার নাকের ডগা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তেল মাখা চুল থেকে গোলাপের গন্ধ বেরুচ্ছে।

'দেখুন, সার,' গর্বের সঙ্গে বলল লোকটা, 'দুই আঙুলের কাজে পারদর্শী, এরকম একটা অভিজাত ফ্যামিলি থেকে এসেছি আমি। পারিবারিক ঐতিহ্য কেউ ত্যাগ করে না।'

চোর হলেও, আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর, মাথা উঁচু করে গলি ধরে রওনা হলো সে।

একটু সামনেই ডাস্টবিন, ওটার পাশে বসে ছেঁড়া কাপড় পরা এক বুড়ো আবর্জনা থেকে কিছু বাছাই করছে। তার সামনে থেমে কয়েকটা কয়েন ছুঁড়ে দিল সে, তারপর পা চালিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

কয়েনগুলো নয়, পকেটমারের গমনপথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বুড়ো লোকটা। তারপর দ্রুত সেগুলো কুড়িয়ে পকেটে ভরল।

মেইন রোডে ফিরে এসে ক্যাসিনো বিগ ডিল-এ ঢুকল আবার রানা। বডিবিল্ডার গার্ড এবার স্যালুট করল ওকে। প্রথমে বার-এ ঢুকল রানা। বেশিরভাগ টেবিল বিদেশিরা দখল করে রেখেছে, তাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গই বেশি, তবে উপমহাদেশের কিছু লোকও আছে, আর আছে সিঙ্গাপুরি চিনারা। তবে, বারম্যান, ওয়েটার, মিউজিশিয়ান, সিগারেট-গার্ল প্রায় সবাই থাই। হবারই কথা, কারণ এটা থাই থান্ডারের লিডার চক্রি চুয়ানের ব্যবসা।

বার-এর একটা টুলে বসে বিয়ার চাইল রানা। এই সময় মঞ্চের উপর জ্যান্ত হয়ে উঠল ব্যান্ডপার্টি। ড্রামের সঙ্গে বাজাচ্ছে একজন আর্কোডিয়ানিস্ট, দু-জন গিটারিস্ট, একজন পিয়ানিস্ট আর চারজন ভায়োলিনিস্ট। সেই সঙ্গে গেস্টরা কেউ কেউ জোড়া বেঁধে মঞ্চে উঠে নাচতে শুরু করল।

মগটা খালি করে বারে ঠুকল রানা। অন্যদিকে ব্যস্ত বারম্যান,

তার বদলে একজন বারমেইড এগিয়ে এল। চেহারা দেখে মেয়েটিকে শ্রীলঙ্কান বলে মনে হলো ওর। লম্বা-চওড়া কাঠামো, কালো স্কার্ট ও লাল ব্লাউজ পরে আছে, স্কার্টের সামনে অ্যাপ্রন ঝুলছে। মেয়েটার হাত দুটো মোটাসোটা, পেশল। কানে একটা পেন্সিল গোঁজা, ব্যবহার না করায় চোখা হয়ে আছে। রানার গ্লাসটা নিয়ে শুঁকল সে, বলল, 'হেনিকেন।'

'পিপে না বোতল বা ক্যান থেকে?' মেয়েটি স্পেশালিস্ট কিনা পরীক্ষা করছে রানা, হাসছে।

'পিপে,' বলল মেয়েটি, প্রশ্ন করায় বিরক্ত হয়েছে। 'এখনই আসছি।' খুঁটিয়ে দেখল রানাকে, তারপর আরেক কাস্টমারের গ্লাস তুলে নিয়ে শুঁকল, সবশেষে নোটবুকে অর্ডার লিখে পিছন ফিরল ওদের দিকে।

পকেট থেকে পঞ্চাশ সিঙ্গাপুরি ডলারের একটা নোট বের করল রানা, ভাঁজ করে রেখে দিল তালুতে। বাকি সবাইকে বিয়ার দিয়ে রানার কাছে ফিরে এল মেয়েটি। গ্লাসটা ওর সামনে রাখল সে, অর্ধেকটাই ফেনায় ভর্তি হয়ে আছে। 'আর কিছু?' জানতে চাইল।

ভাঁজ করা নোটটা তার অ্যাপ্রনের পকেটে ঢুকিয়ে দিল রানা। চেহারা দেখে বুঝতে পারল, মেয়েটি রাগ করছে না। তারমানে লেনদেনের এই ভাষাটা বোঝে সে। 'আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি,' বলল ও। 'আমার কাছে একটা জিনিস আছে, এক ভদ্রলোককে দিতে চাই।'

'কী জিনিস?' ভ্রূ কোঁচকাল মেয়েটি।

'একটা প্ল্যাটিনাম ব্রেসলেট,' বলল রানা। 'ওটা আমি একটা বাড়ি থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। তাতে এক ভদ্রলোকের নাম লেখা আছে।'

'কী নাম?'

'চক্রি চুয়ান।'

কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে রানার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। তারপর অ্যাপ্রনের পকেটে হাত ভরে নোটটা বের করে ভাঁজ খুলল। উল্টেপাল্টে দেখল সেটা, সবশেষে রানার সামনে কাউন্টারে রেখে দিল। 'আর কী?'

'আর কিছু না।'

ওর সামনে থেকে সরে গেল মেয়েটি। টাকাটা পকেটে ভরল রানা, বিয়ারের গ্লাস তুলে চুমুক দিল। লক্ষ করল, ওর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে মেয়েটি।

একটু পর কাছে ডেকে খালি গ্লাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

সেটা নিয়ে হাসল মেয়েটি। 'চক্রি চুয়ান? ঠিক জানেন এই নামেরই কাউকে খুঁজছেন আপনি?'

'জানি।'

'এই ব্যবসাটার মালিক তিনি,' গলা আরও খাদে নামিয়ে বলল মেয়েটি, তারপর রানার সামনে হাত পাতল।

নোটটা আবার বের করে তার তালুতে রাখল রানা। 'কোথায় পাব তাঁকে?'

'পাবেন না,' বলল মেয়েটি। 'অন্য কোথাও ব্যস্ত তিনি। কোথায় আমি জানি না।' খালি গ্লাসটা দু'হাতে ধরে চাপ দিল সে, ফলে তার হাতের পেশিতে ঢেউ উঠল।

'আমার ধারণা, ব্রেসলেটটা ফিরে পেলে দারুণ খুশি হবেন ভদ্রলোক,' বলল রানা। 'তুমি যদি শুধু তাঁর ঠিকানাটা দিতে আমাকে...'

'দুঃখিত, আমি শুধু নিজের ঠিকানা দিতে পারি,' বলে রানার দিকে পিছন ফিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটি।

কাউন্টারে আরও কিছু টাকা রেখে টুল ছাড়ল রানা, বাথরুমে যাবে। হঠাৎ একটা হইচই শুনে ঘাড় ফেরাল ও। বার-এর ঠিক ঢোকার মুখে সুট পরা কয়েকজন থাই খদ্দের কাকে যেন ঘিরে

ধরে মারধর করছে। বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে ও, তাই দেখতে পাচ্ছে না কে মার খাচ্ছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সেদিকে এগোল রানা। যারা মারছে, সম্ভবত থাই ট্যুরিস্ট, সবাই ডোরাকাটা কাপড়ের সুট পরে আছে। তারমানে, ভাবল রানা, এরা একটা গ্রুপ।

দ্রুত পা চালিয়ে আরও কাছে চলে এল রানা। লোকগুলো কোনও শব্দ করছে না, অন্য কোনও দিকে তাদের এতটুকু খেয়াল নেই, প্রত্যেকে শুধু আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে একজন লোককে মারছে। লাথি, কিল, ঘুসি, ফ্লাইং কিক, কারাতের কোপ, যার যেভাবে খুশি মেরেই চলেছে।

বারে আরও অনেক লোকজন রয়েছে, সবাই নির্বিকার দর্শক। এমনকী প্রতিটি স্টাফ নিজের কাজে ব্যস্ত থাকছে, এখানে যেন কিছু ঘটছে না।

দুর্ভাগা লোকটা মেঝেতে পড়ে গেল। আর তখনই তার পরনের হালকা সবুজ রঙের সুট ও বাদামী রঙের টাই দেখতে পেল রানা। আরে, এ তো সেই পকেটমারটা! নিশ্চয়ই ওদের কারও পকেটে হাত ভরে ধরা পড়ে গেছে। নিজেকে সাবধান করে দিল রানা, ডোরাকাটা কাপড়ের সুট পরা থাইগুলো থাই থান্ডারের প্রিয়ভাজনও হতে পারে, কিংবা তারা হয়তো দলেরই লোক।

কিন্তু তাই বলে মেরে ফেলবে?

'স্টপ ইট, জেন্টেলমেন, প্লিজ!' কঠিন সুরে, রীতিমত ধমকের সঙ্গে বলল রানা।

গ্রাহ্য করল না তারা, এমনকী কেউ ওর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। পরিষ্কার বুঝল রানা, এই মুহূর্তে কারও কোনও হুঁশ-জ্ঞান নেই, খুনের নেশায় পেয়েছে তাদেরকে। গণপিটুনি দিতে আসা লোকেরা মন-মানসিকতার দিক থেকে পেশাদার খুনির চেয়ে কম নীচ বা কম নিষ্ঠুর নয়। এদেরকে রানা বাস্টার্ড বলে গালি দিয়ে মনের ঝাল মেটায়।

রানার মাথায় এই মুহূর্তে শুধু একটা চিন্তাই খেলছে। যেভাবে হোক বোকা ও আনাড়ী লোকটাকে বাঁচাতে হবে। লঘু পাপে এরকম গুরু দণ্ড পাবে কেউ, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে ও, তা স্রেফ সম্ভব নয়। অন্তত ওর প্রাণ থাকতে নয়।

মাসুদ রানা কী কারণে মাসুদ রানা, আরেকবার সম্ভবত তারই একটা উদাহরণ সৃষ্টি হতে চলেছে। পাঁচ-সাতজন শক্ত-সমর্থ তরুণের সঙ্গে একা লাগতে যাচ্ছে ও, এ-কথা জানার পরেও যে, এই প্রতিষ্ঠান শত্রুপক্ষের একটা আস্তানা।

হাত বাড়িয়ে প্রথমে যাকে সামনে পেল ধরল দু'হাতে, তারপর আসুরিক শক্তিতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে। রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ আছে, ওর ক্ষিপ্রতা চোখ দিয়ে অনুসরণ করা যাচ্ছে না। দুই সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে ডোরাকাটা সুটের তিন মালিক দশ-বারো হাত দূরে ছিটকে পড়ল, টেবিল-চেয়ারের পায়ার সঙ্গে মাথা কিংবা কপাল ঠুকে যাওয়ায় ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

এক পলকে বদলে গেল বার-এর পরিস্থিতি। স্টাফ, খদ্দের সবাই চোখে-মুখে আতংক নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

মারমুখো বাকি চার থাই স্থির হয়ে গেছে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ওরা। তারপর যেন দম দেওয়া পুতুলের মত, পকেটমারকে পিছনে রেখে চারজন একযোগে এগিয়ে এল রানার দিকে।

ভোজবাজির মত পিস্তল বেরিয়ে এল রানার ডান হাতে, বাম হাতে আইডি কার্ডের মত কিছু একটা। 'ওখানেই থামো,' নির্দেশের সুরে বলল ও। 'পুলিশ!' ওর জানা আছে, সিঙ্গাপুর পুলিশে উপমহাদেশের বহু লোক চাকরি করে। কার্ডটা পকেটে ভরে রাখতে রাখতে পকেটমারের দিকে এগোল ও, যেন থাইদের তৈরি পাঁচিলটা সম্পর্কে সচেতন নয়।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ফাঁক হয়ে গেল পাঁচিল। কারও দিকে না তাকিয়ে রক্তাক্ত লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। সবুজ

কাপড়ে মোড়া হাড় ও মাংসের ছোট একটা স্তূপ বলে মনে হলো মানুষটাকে। এত মার খেয়েও জ্ঞান হারায়নি সে, আহত বিড়ালছানার মত হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

তারপর রানাকে হকচকিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'আপনি মহৎ ব্যক্তি, সার!' বলেই ঢলে পড়ল সে।

মারা গেল? তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। পালস আছে দেখে সিধে হলো আবার, ঘুরে পে বুদের দিকে এগোচ্ছে। খেয়াল করল, ডোরাকাটার গ্রুপের একজনও বার-এ নেই। পুলিশকে কে না ভয় পায়।

দশ মিনিটের মধ্যে অ্যামবুলেন্স এসে নিয়ে গেল অজ্ঞান পকেটমারকে। একজন মেইল নার্সকে নিজের হোটেলের ঠিকানা দিল রানা, প্রয়োজনে যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

এতক্ষণে বাথরুমে ঢোকার সুযোগ পেল ও।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা দেখল বার-এর সবাই যে-যার কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কী কারণে কে জানে ভুলেও কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে না। বার থেকে বেরিয়ে এল ও, চওড়া করিডর হয়ে ঢুকল আলো-ঝলমলে ক্যাসিনোয়।

একটা টেবিলে বসে রুলেত খেলার ছলে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল রানা। ডোরাকাটাদের কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কেউ বিশেষভাবে লক্ষও করছে না ওকে। অল্প কিছু সিঙ্গাপুরী ডলার হেরে বিশ মিনিট পর উঠে পড়ল রানা। অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এক ফাঁকে ভিতর দিকের একটা করিডরে চলে এল ও। খানিকদূর হাঁটার পর দুপাশে কয়েকটা দরজা দেখতে পেল। দরজার মাথায় লেখা রয়েছে – অফিস। এগোচ্ছে রানা, সামনে একটা বাঁক পড়ল।

ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে বাঁকটা ঘুরল রানা, করিডর ধরে সাবধানে এগোচ্ছে। একটা তেমাথা দেখা যাচ্ছে, তবে নাক

বরাবর সামনে একটা দরজা রয়েছে। এই দরজার গায়ে লেখা রয়েছে – অফিস অভ দ্য চিফ।

দরজার সামনে পৌঁছাবার আগেই রানার হাতে ছোট একটা আইভরি কেস বেরিয়ে এসেছে। কেসটা থেকে বেরুল সরু টুথপিকের মত দেখতে ইস্পাতের একটা কাঠি। কী হোলে সেটা ঢোকাতে যাচ্ছে ও।

এই সময় পিছন থেকে ভারী পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। যেই আসুক, বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে সে, এখনই দেখে ফেলবে রানাকে।

দরজার সামনে থেকে দ্রুত ডান দিকে সরে গেল রানা, তারপর করিডরটা আড়াআড়িভাবে পার হলো, তেমাথার কোণে গা ঢাকা দিয়ে আছে। ওর কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে জ্যানিটার-এর ক্লজিট, চৌকাঠে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে লাঠির মাথায় ভেজা স্পঞ্জ । দেয়ালে গা সেঁটে কান পেতে থাকল রানা।

লোকটার হেঁটে আসবার আওয়াজের মধ্যে দৃঢ় একটা ভাব আছে, যেন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে সে। দু'পা এগিয়ে ক্লজিটের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা, সামান্য খোলা রাখল দরজাটা।

দ্রুত হাতে সুট-জ্যাকেট খুলে ফেলছে রানা, তাকিয়ে আছে হুকে ঝুলিয়ে রাখা ঘামের দাগসহ জেনিটারের কভারঅল-এর দিকে। ঝটপট পরে নিল ওটা।

শক্তি প্রয়োগের চেয়ে ধোঁকা দিয়ে কাজ হাসিল করা অনেক সময় সহজ। ধরা পড়বার কোনও ইচ্ছে নেই রানার, চায় না কারও চোখে পড়ে যাক।

কভারঅলের চেইনটা বুক পর্যন্ত টেনে আনল রানা, তারপর হাত বাড়িয়ে করিডর থেকে টেনে নিল লাঠিটা। মরচে ধরা ধাতব বালতিতে ঢুকিয়ে স্পঞ্জটা সশব্দে নাড়তে শুরু করল।

পায়ের আওয়াজ থেমে গেল ক্লজিটের বাইরে। 'কে ওখানে? শামসু নাকি?' কর্তৃত্বের সুরে থাই ভাষায় প্রশ্ন করল কেউ।

'না, সার,' থাই ভাষাতেই, ভারী গলায় জবাব দিল রানা। মুখটা ঢাকার জন্য হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো কপালে নামিয়ে আনল ও। একটু কুঁজো হলো, যাতে বেশি লম্বা না দেখায়।

এরপর পা দিয়ে দরজার ঠিক বাইরে বালতিটা ঠেলে দিল রানা। তারপর কুঁজো পিঠ ও বাঁকা পা নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ও।

'আমাকে শামসু পাঠিয়েছে,' বলল রানা, বালতিটা পা দিয়ে ঠেলছে।

'আওয়াজটা থামাও,' ধমক দিল লোকটা। 'তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

থামল রানা, চুলের তৈরি পরদার ভিতর দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি হবে, বেঢপ নাক, গায়ের রঙ শ্যামলা। 'শামসু পাঠিয়েছে আমাকে,' আবার বলল ও, তারপর স্পঞ্জটা রোলার-এর মাঝখানে ফেলে হাতল ঘোরাল পানি বের করবার জন্য। 'আপনাকে কিছু বলেনি?'

'কখন বলল!' লোকটার গলায় ঝাঁঝ, চোখ দুটো কুঁচকে আছে। ক্রূর একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে। 'তবে হাড়ে হাড়ে টের পাবে এই অনিয়ম করার কী ফল!'

'আপনি চান না মেঝেগুলো পরিষ্কার করা হোক?' ক্লজিটে ঢুকে এক বোতল অ্যামোনিয়া বের করল রানা, আচরণে এতটুকু নার্ভাস ভাব নেই। শরীরের পাশে ঝুলে থাকা হাত দুটো মুঠো পাকাল লোকটা। বালতির পানিতে অ্যামোনিয়া ঢালছে রানা। খেপে থাকা লোকটা ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল, তারপর ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল।

কাজ থামিয়ে কান পেতে থাকল রানা, বাঁক ঘুরে দূরে মিলিয়ে গেল লোকটার পায়ের আওয়াজ। ক্লজিটে ঢুকে নিজের কাপড়চোপড় পরে নিল ও, হাতে ইস্পাতের টুথপিক নিয়ে আবার ফিরে এল অফিস রুমের দরজায়।

যেমন ধারণা করেছিল রানা, দরজায় তালা দেওয়া। করিডরটা আরেকবার দেখে নিল। এখনও খালি। কী হোলে টুথপিক ঢোকাল ও, বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের আবিষ্কার ওটা। ভিতরে ঢুকে ওটার সঙ্গে থাকা কমপিউটারাইজড ইলেকট্রনিক ডিভাইস নতুন করে সাজাল তালার যন্ত্রপাতিগুলো। ক্লিক করে আওয়াজের সঙ্গে খুলে গেল তালা। কেউ বুঝতে পারবে না এই তালায় হাত দেওয়া হয়েছে।

অন্ধকার অফিসে ঢুকল রানা। কবাট বন্ধ করে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। টুথপিকটা আইভরি হোল্ডারে ভরল, ঢাকনি বন্ধ করল, তারপর শেষমাথায় চাপ দিল মৃদু। সরু, তবে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো বেরুল ওটা থেকে।

কামরার চারদিকে আলো ফেলল রানা। এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে ফেলা ডেস্কটা বেশ বড়, ওটার পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ার; আরেক প্রান্তে কফি টেবিল, সোফা ও তিনটে দেরাজসহ ফাইল কেবিনেট। মেঝের উপর দিয়ে ফাইল কেবিনেটের দিকে এগোল ও।

রানা বুঝতে পারছে এটা সাধারণ একটা অফিস, কোথাও এমন কিছু নেই যেটা দেখে বোঝা যাবে নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি ব্যবহার করে। একটাই বৈশিষ্ট্য, ফাইল কেবিনেটের বাম পাশের দেয়ালে বাঁধাই করা আট-দশটা ফটো ঝুলছে। প্রতিটি ফটোর গায়ে সাল লিখে রাখা হয়েছে – ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ। প্রতি বছরের জন্য দুটো করে ফটো।

ফটোগুলোয় পোজ দিয়েছে ক্যাসিনোর সমস্ত স্টাফ। রেস্তোরাঁ ও বার-এর কর্মীরাও আছে। ছয় ও সাত নম্বর ফ্রেমে দুটো গ্রুপ ফটো দেখল রানা, ওগুলোয় স্টাফ ছাড়াও মালিকপক্ষের লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। তাদের একজনকে চিনতে পারল রানা। স্ত্রী-সন্তানসহ বুকরিত প্রেমজ, থাই থান্ডারের লিডার।

আসলে সাবেক লিডার। পরের ছবি দুটোয় স্টাফের সঙ্গে

পোজ দিয়েছে চক্রি চুয়ান।

যাক, ঠিক জায়গাতেই এসেছে রানা। ফটোগুলোর সামনে থেকে সরে ফাইল কেবিনেটের কাছে চলে এল ও, নব ধরে টান দিয়ে উপরের দেরাজ খুলছে। তালা দেওয়া থাকায় খুলল না। আবার টুথপিকটা বের করতে হলো ওকে।

দেরাজ খোলার পর ভিতরে খাড়াভাবে সাজানো একগাদা ফাইল দেখল রানা। একটা ফাইলে খরচের হিসাব লিখে রাখা হয়েছে – স্টাফের বেতন, ফার্নিচারের দাম, দৈনন্দিন কেনাকাটা, ফোনের বিল, ডিশ লাইন ও টেলিফোনের বিল ইত্যাদি। আরেকটায় রয়েছে ক্লিপ দিয়ে আটকানো অসংখ্য বিদ্যুৎ বিল ও বাড়ি ভাড়ার রসিদ।

মাত্র একবছর আগে বুকিত বাটক রোডে, নিউ টাউনের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। বাড়িটার মাসিক ভাড়া বাংলাদেশী টাকায় প্রায় দুই লাখ, অথচ টেলিফোনের বিলে দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে কেউ কোনও ফোন করেনি। এর সঙ্গে মিল রেখে বিদ্যুৎ বিলও এসেছে নাম মাত্র। যে বাড়ির ভাড়া দু'লাখ টাকা, সেখানে ফোন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার না করবার কী কারণ থাকতে পারে?

এমন কি হতে পারে ওটা থাই থান্ডারের একটা সেফ হাউস, শুধু কেয়ারটেকার একা থাকে? রানা ভাবল, এটা হয়তো বড় কোনও সূত্র নয়, তবে একবার ঢু মেরে দেখা যেতে পারে। বাড়ির ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল ও।

উপরের দেরাজে আরও প্রচুর কাগজ-পত্র আছে, সবই দায়-দেনা পরিশোধ সংক্রান্ত, রানার আগ্রহ বোধ করবার মত কিছু নয়। বাকি দুটো দেরাজে শুধুই সয়-সম্পত্তির দলিল – সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে বেশ কয়েকটা নাইট ক্লাব, ক্যাসিনো আর ম্যাসাজ পারলার কিনেছে চক্রি চুয়ান, তবে একটাও তার নিজের নামে নয়। একটা নাইট ক্লাব ও ক্যাসিনো কেনা হয়েছে চিত্রলেখা

মাহিদলের নামে।

শেষ দেরাজটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল রানা। অফিসের মেঝে পার হচ্ছে, ফার্নিচারের উপর টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে কিছু এলোমেলো করে রেখে যাচ্ছে কি না।

রানাকে সতর্ক করল দরজার কবজা থেকে আসা ক্ষীণ আওয়াজ। করিডরের এক চিলতে আলোও কামরার ভিতর ঢুকে পড়ছে।

ঝট করে খুলে গেল কবাট, একই সঙ্গে রানার হাতেও বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। ডাইভ দিয়ে ডেস্কের পিছনে পড়ল ও।

অফিসের ভিতর ছোট্ট কী যেন একটা ফাটল, ভোঁতা শোনাল রানার কানে। লাফ দিয়ে সিধে হলো ও। ওর সঙ্গে গ্যাস মাস্ক নেই। বড় করে শ্বাস টেনে যতটা পারা যায় বাতাস ভরল ফুসফুসে, তারপর কমলা ও ধূসর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ছুটল দরজার দিকে, ভাবছে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে কে জানিয়েছে – বারমেইড, নাকি বদমেজাজি সুপারভাইজার?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শরীরের চামড়ায় বাষ্প অনুভব করল রানা। বিপদে পড়ে গেছে ও। এ এমন এক ধরনের গ্যাস, ফুসফুসে গ্রহণ করবার দরকার নেই।

দরজা দিয়ে রানা নয়, যেন একটা উন্মত্ত তুফান বেরিয়ে গেল, হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল।

লোহার মত শক্ত হাত জড়িয়ে ধরল ওকে। ধস্তাধস্তি করছে রানা, লড়ছে, গুলি ছুঁড়ছে, চেষ্টা করছে যদি পালাতে পারে।

দেরি হয়ে গেছে। ওর ত্বক শুষে নিয়েছে গ্যাস। বাড়ানো হাতের ভিতর জ্ঞান হারাল রানা।

তেরো

রানার ডান দিকটা তন্দুরের তীব্রতা নিয়ে জ্বলছে। বাম দিকে বরফ হয়ে আছে শরীর।

স্বপ্নের ভিতর একটা দৈত্যকে ফাঁকি দিচ্ছে রানা। ওটার জয়েন্ট ঘষা খাওয়ার মুড়মুড় আওয়াজ ও দূষিত নিঃশ্বাসের ঝড়ো সোঁ-সোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছে, এই বুঝি ধরে ফেলল। যতবার ওটার নাগাল থেকে সরে আসতে পারছে, পরিশ্রমে দপদপ করছে মাথাটা।

'শালার ব্যাটার সাহস কত!' থাই ভাষায় বলল একজন। 'আমাদের আস্তানায় ঢুকে আমাদের গায়ে হাত তোলে!'

রানা ভাবল, তারমানে? এরা ডোরাকাটা?

লোকটার কণ্ঠস্বরে হিংস্রতা থাকলেও, তার কয়েকজন সঙ্গী হেসে উঠল।

'ব্যাটার জ্ঞান ফিরছে!' আবার বলল লোকটা। 'দেখা যাক কুত্তার লেজ আমরা সোজা করতে পারি কি না।' অর্থাৎ এখন রানার মুখ খোলাবার চেষ্টা করা হবে।

চোখ মেলল রানা। মাথাটা ব্যথায় ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হলেও, ধীরে ধীরে চোখ ঘোরাল ও। রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে একটা টেবিলের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে, টেবিলটা দেয়ালের গায়ে কাত করে রাখা।

দেয়ালে দু'তিনটে মশাল জ্বলছে।

রানার মনে হলো, প্রাচীন কোনও পাথুরে পোড়োবাড়ির বেযমেন্টে রয়েছে ও। পাথরের তৈরি দেয়াল কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে। দেয়ালের ফাঁকগুলো থেকে ভেসে আসছে রাতের

জঙ্গলের চেনা গন্ধ – ঢাকার রমনা পার্কে সন্ধের পর গাছের গা থেকে এই গন্ধ বের হয়। মাথার উপর বেযমেন্ট ও একতলার ভাঙা ছাদের কিনারা দেখা যাচ্ছে, তার উপর আকাশ যেন কালো চাদর, চাদরের গায়ে বসেছে তারার মেলা। ওকে কি কোনও জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়েছে?

'মাথায় খুব ব্যথা?' সেই লোকটাই কর্কশ সুরে জানতে চাইল। একহারা কাঠামো তার, চোখে চশমা, চেহারায় আঁতেল-আঁতেল ভাব। হ্যাঁ, গায়ে ডোরাকাটা কাপড়ের সুট।

রানার ডান দিকে একটা চুলো জ্বলছে, ফলে ওর ওদিকটা সেদ্ধ হচ্ছে গরমে। ভাঙা দেয়াল দিয়ে হিম বাতাস এসে লাগছে শরীরের অপর পাশে।

আরেক লোককেও, এখনও অজ্ঞান, অন্য একটা টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। সেটা চুলোর ওপারের দেয়ালে কাত করা। তার গোটা চেহারা থেঁতলানো হয়েছে, শুকিয়ে যাওয়া রক্ত লেগে রয়েছে ঠোঁট, চোখ, নাকের ফুটো ও কপালে। লোকটাকে থাই বলে মনে হলো রানার।

'গ্যাস থেকে মাথাব্যথা? উহ্, সে বড় কষ্ট!' বলল ধানাই ঠাকুর, রানার ভোগান্তি উপভোগ করছে সে। সবজান্তার মত মাথা দুলিয়ে হাসছে, পিস্তল ধরা হাতটা এমনভাবে শরীরের পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে রানা যাতে দেখতে পায়। ওটা রানারই ওয়ালথার।

'হঠাৎ করে ব্যথাটা কমে গেল,' বলল রানা, লোকটার ছোট চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসল মৃদু। হাসিটা ওর নার্ভাস সিস্টেমে আকস্মিক ব্যথার জন্ম দিলেও, নিজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারল ও, চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপতে দেয়নি।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'চক্রি চুয়ানের স্যাঙাৎ, ঢাকার অপারেশনে ছিলে?'

ধানাই ঠাকুরের মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল। বোকা বোকা লাগছে তাকে। 'এত কথা তুমি শালা জানো কীভাবে?' কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল। 'এই ব্রেসলেটটই বা কোথায় পেলে?'

'তারমানে বারমেইডের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার,' বলল রানা। 'ওটা আমি ঢাকার একটা বাড়ির ড্রাইভওয়ে থেকে পেয়েছি। বারমেইড বলেনি, চক্রি চুয়ানকে খুঁজছি আমি?'

ধানাই ঠাকুরের নেতৃত্বে বেযমেন্টে আরও তিনজন থাই রয়েছে। প্রত্যেকের পরনে জিনস ও জ্যাকেট। চোখে-মুখে হিংস্র ভাব নিয়ে হেলান দিয়ে আছে দেয়ালে, হাতে সাব-মেশিনগান।

'কেন খুঁজছ?' জানতে চাইল ধানাই ঠাকুর, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ করছে রানাকে।

'ব্রেসলেটটা ফিরিয়ে দিয়ে মোটা পুরস্কার আদায় করব,' জানাল রানা। লোকগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে রশিগুলো পরীক্ষা করছে ও। খুব শক্ত করে বাঁধা হয়েছে ওকে, হাত-পা মুচড়েও এক চুল শিথিল করা যাচ্ছে না, গিঁটগুলো সব টেবিল-সারফেসের পিছনদিকে। হয় অস্ত্র লাগবে, নয়তো কারও সাহায্য, তা না হলে এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়।

'কোথায় রেখেছ সেটা?' জিজ্ঞেস করল ধানাই ঠাকুর।

'হোটেলের স্যুইটে।'

'কোন্ হোটেলে?'

'তুমি গর্দভ নাকি?' হেসে উঠল রানা। 'ভেবেছ ব্রেসলেটটা তোমার হাতে তুলে দেব আমি? চক্রি চুয়ানকে খবর দাও। লেনদেন যা হবার তার সঙ্গে হবে।'

ঝট্ করে পিস্তল ধরা হাতটা তুলল ধানাই ঠাকুর। রানার গলার পাশে মাজল চেপে ধরল সে। 'কর্ণ থানম বলছে যেন আমি এক্ষুনি তোমাকে খুন করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলি।'

নির্ভয়ে হাসল রানা। 'চক্রি চুয়ান, তোমাদের বস্, খুশি হবে না।'

'থানমের ধারণা, তুমি বিসিআই এজেন্ট, গন্ধ শুঁকে এখানে পৌঁছেছ।'

'এ-কথা বলছে না যে, বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে যেতে এসেছি?' প্রশ্ন করল রানা।

ধানাই ঠাকুর অবাক হলেও, চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না। রানার গলা থেকে পিস্তলটা নামাল সে, ওটার ওজন অনুভব করল, তারপর অকস্মাৎ খালি হাত মুঠো পাকিয়ে রানার চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল।

টেবিলের সারফেসের সঙ্গে ঠুকে গেল রানার মাথা। কান দুটো ভোঁ-ভোঁ করছে। মাথার ব্যথাটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

'এরকম আদর করলে হবে না,' বলল থানম। 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, ওস্তাদ, তারপর দেখো কেমন বাপ-বাপ চেঁচায়! মুখ খুলবে না, ওর বাপ খুলবে...'

'শুনলে, কী বলছে থানম?' জিজ্ঞেস করল ধানাই ঠাকুর। 'তবে আমার কথা হলো, তুমি যদি সত্যি কথা বলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাও, তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া উচিত আমাদের। আফটারঅল, ধর্মে আছে জীবহত্যা মহাপাপ। শুরু করি, ঠিক আছে? তোমার নাম?'

'উহ্, আহ্ ... উহ্, আহ্...' জ্ঞান ফিরে পেয়ে দ্বিতীয় বন্দি গোঙাচ্ছে। 'পা-পানি... পা-পানি...'

ইমিডিয়েট বস্ ধানাই ঠাকুরের ইশারায় এগিয়ে এল থানম, তারপর দুজন একসঙ্গে দ্বিতীয় বন্দির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে লোকটার। মোটাসোটা কাঠামো তার, নরম শরীর, কালো বিজনেস সুট ও সাদা টাই পরে আছে। শরীরে পেঁচানো রশিগুলো তার ট্রাউজারটাকে তুলে ফেলেছে বেশ

খানিকটা, ফলে জুতোর বাইরে বেরিয়ে থাকা পুরু কালো মোজা দেখা যাচ্ছে।

'টাকা নেই, পানিও নেই,' তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ধানাই ঠাকুর। 'শালা থাই থান্ডারের নাম ডোবালি! বস্ বলেছে, তোর চোদ্দগুষ্টিকে বরবাদ করে দেব আমরা।'

মোটা লোকটা চোখ খুলল, বেযমেন্ট দেয়ালের ফাঁকগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে সে। 'ভগবানের কিরে, এর মধ্যে আমার কোনও কারসাজি নেই। আমার চোখের সামনে জিকো তানাই নিজের হাতে ডলারের বান্ডিলগুলো সুটকেসে ভরেছে, কী করে জানব ওগুলো সব জাল টাকা!' আবার গোঙাল সে। 'পা-নি...'

ও, আচ্ছা! রানা ভাবছে। বন্দি লোকটা তা হলে প্রেম তিলসুলানন্দ! থাই টং-এর আস্তানা থেকে তারই তো পাঁচ মিলিয়ন ডলার নিয়ে আসার কথা।

চামড়ার বড় একটা পুরানো সুটকেসে লাথি মারল ধানাই ঠাকুর। সুটকেসের খোলা মুখ থেকে চুলোর আগুনে ছিটকে পড়ল মার্কিন ডলারের কয়েকটা বান্ডিল। বাতাসে ছাই উড়ল, শুকনো কাগজ পেয়ে দপ করে মাথা তুলল শিখাগুলো।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে নন্দর দিকে তাকাল ধানাই। দুজনের নাক মাত্র কয়েক ইঞ্চির দূরে। চুলো ও মশালের অস্থির আলো তাদের চেহারায় খেলা করছে – একজন আতংকিত, অপরজন হিংস্র।

'শালা বেজন্মা!' হিসহিস করে উঠল ধানাই। 'তুই দলের সঙ্গে বেঈমানী করেছিস। লোভ সামলাতে না পেরে সরিয়ে ফেলেছিস পাঁচ মিলিয়ন ডলার।'

ম্লান, কাতর স্বরে বলল নন্দ, 'সরাবার ইচ্ছে থাকলে আগে কেন সরাইনি? সাত বছর ধরে আনা-নেওয়ার কাজ করছি, কখনও কোনও ঘাপলা হয়েছে? তা ছাড়া, ভেবে দেখো, এরকম

বোকামি কেউ করে? এত টাকা মেরে দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে? এটা আমার কাজ হলে আমি পালাতাম না?'

'এখানেই তো চালাকিটা করেছিস,' বলল ধানাই। 'সাধু সাজার জন্যে সুটকেসে জাল ডলার ভরে নিয়ে এসেছিস, ভান করছিস সুটকেসে জাল টাকা কি আসল টাকা জানিস না!' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'এখনও সময় আছে, নন্দ। ডলারগুলো কোথায় রেখেছিস বল, বস্‌কে বুঝিয়ে মাফ চাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই...'

জবাবে নন্দ মাথা নাড়তে যাচ্ছে দেখে তার ভাঙা নাকে ধাম করে ঘুসি মারল ধানাই। ব্যথায় ককিয়ে উঠল নন্দ, চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। তার চেহারায় করুণ মিনতি ফুটে আছে, লক্ষ করল রানা। সেই সঙ্গে অপমানিতও বোধ করছে।

আরেকটা ঘুসি খেয়ে বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করল নন্দ।

'থানম!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল ধানাই, শুনে শিউরে উঠল নন্দ।

ইমিডিয়েট বস্‌কে দেখল থানম, তারপর তার দুই সঙ্গীর দিকে ফিরে নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। লোক দুজন নন্দের দিকে এগিয়ে গেল।

'না!' আতংকে চেঁচিয়ে উঠল নন্দ, এমন সিটকে গেল, যেন টেবিলের তক্তার ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চায়।

জানে সম্ভব নয়, তারপরও বাঁধনগুলো ঢিল করবার চেষ্টা করছে রানা। অবিরত কবজি মোচড়াচ্ছে, ছুরিটার নাগাল পাওয়ার ইচ্ছে। থাই থান্ডার কি পেয়ে গেছে ওটা?

থানম একটা দৈত্য। হাতগুলো বিরাট। দুইহাতে নন্দের বুকের খাঁচায় মাঝারি মাপের ঘুসি মারছে অনবরত। তাতেই মোটা লোকটার প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়। ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। তারপর বমি শুরু হয়ে গেল।

হাতে থুতু দিয়ে দু-হাত ঘষল থানম, পেশাদার বক্সারের ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল দুই কদম।

বাকি দুজন দ্রুত সামনে বাড়ল। প্রথম লোকটা নন্দের কিডনিতে ঘুসি চালাল। আবার আর্তনাদ বেরিয়ে এল নন্দের গলা থেকে। দ্বিতীয় লোকটা হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল তার ঊরুসন্ধিতে, তারপর ঘাড়ের পাশে কারাতের একটা কোপ মারল যত জোরে পারা যায়।

বোমা ফাটার মত আওয়াজ করে টেবিলের সারফেসে ঠুকে গেল নন্দের খুলি। তার চিবুক নেমে এল বুকে।

'থামো!' বলল ধানাই ঠাকুর।

রানার কনুইয়ের নীচে এখনও স্ট্র্যাপে আটকানো রয়েছে ছুরিটা। কিন্তু রশির বাঁধন এত আঁটসাঁট যে ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে হাতে নিয়ে আসা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে হাতটা আগুপিছু করছে ও, প্রতিবার এক ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ।

চিবুক সামনে বাড়ানো, চোখ সরু, নেতিয়ে পড়া নন্দের দিকে এগোল ধানাই ঠাকুর। আহত লোকটার চুল খামচে ধরে মাথাটা উঁচু করল সে। 'আমার দিকে তাকা, নন্দ! টাকাটা তুই যদি না মেরে থাকিস, তার মানে দাঁড়ায় থাই টং আমাদেরকে পেমেন্ট করবে না। তা হলে আমাদের সঙ্গে তারা নেগোশিয়েশন করল কেন? ডক্টর নাদিরাকে তাদের দরকার নেই?'

'আ-আমি জা-নি ন্না...' অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল নন্দের গলার আওয়াজ।

'শিট্!' তার চুল ছেড়ে দিল ধানাই ঠাকুর। নন্দের মাথা নুয়ে পড়ল। তারপর নিথর হয়ে গেল শরীরটা।

রানার বাঁধনে ঢিল পড়ছে। বেশি নয়, তবে এভাবে চালিয়ে গেলে নিজেকে মুক্ত করবার সুযোগ একটা আসতেও পারে।

অচেতন নন্দের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ধানাই, তারপর থোক করে খানিকটা থুথু ফেলল তার মুখ লক্ষ্য

করে। ঘুরে রানার দিকে তাকাল সে। 'ভেবো না এত সহজে পার পাবে তুমি,' কঠিন সুরে বলল সে।

থাই থান্ডারের তিন বডিবিল্ডার তাদের ইমিডিয়েট বস্ ধানাই ঠাকুরকে নিয়ে এগিয়ে এল। রানা যেন এক টুকরো হাড়, ওকে মাঝখানে রেখে বেওয়ারিশ কুকুরের মত চক্কর দিচ্ছে তারা। জানে সবাই তারা ভাগ পাবে, কাজেই সময়টা উপভোগ করবার সুযোগ হাতছাড়া করছে না।

হুমকিটা গ্রাহ্য না করে হাসল রানা। 'তোমরা, থাই থান্ডার, ব্যাপারটার সঙ্গে জড়ালে কীভাবে?' খুব যেন কৌতূহল হচ্ছে ওর, আসলে ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছে। 'শুনেছি চক্রি চুয়ান নাকি শেয়ালের চেয়েও চালাক, কিন্তু এই তার নমুনা? থাই টং তাকে ল্যাং মেরে দিল?'

কাজ হলো কৌশলে, চক্কর দেওয়া বন্ধ করে ওর কথার জবাব দিচ্ছে থানম। এই সুযোগে চুপিসারে রশির বাঁধনগুলো আরও ঢিল করে আনছে রানা।

কার প্ল্যান, এক এক করে কীভাবে সংগঠনগুলোকে জড়ানো হয়, সংক্ষেপে সব জানাল কর্ণ থানম।

সুযোগ পেয়ে জরুরি একটা প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। 'দুরন্ত ঈগলকে তোমরা ঢাকা থেকে আনতে পারনি।' কথাটা সত্যি কি না জানা খুব জরুরি।

'বস্, এ শালা দেখছি আমাদের হাঁড়ির খবর বের করতে চাইছে! আমরা জেরা করব কী, ও ব্যাটাই আমাদেরকে জেরা করতে চায়।'

'তার মানে প্লেনটা তোমরা সত্যি আনতে পারনি,' বলল রানা, আশা করছে প্রতিবাদ করবে থানম।

'সব ব্যবসারই কিছু গুমর থাকে, ভুলেও কখনও তা ফাঁস করতে নেই,' বলল ধানাই ঠাকুর।

'তোমাদেরকে এই ব্যর্থতার খেসারত দিতে হবে না? যাদের

হয়ে কাজ করছ ওদের ইন্টেলিজেন্স মানবে?'

হেসে উঠল ধানাই ঠাকুর। 'এর মজাই তো এখানে!' বলল সে। 'কোথাও ব্যর্থ হলে ওরা যদি কাউকে ধরে তো ধরবে তাইওয়ানিজ ইন্টেলিজেন্সকে, ওরা ধরবে তাইওয়ানিজ টংকে, তাইওয়ানিজ টং ধরতে চাইবে থাই টংকে, এভাবে। আমাদের সঙ্গে শুধু থাই টং-এর কারবার, আর কাউকে আমরা চিনি না।'

'কিন্তু থাই টং তোমাদের পাওনা টাকা দিচ্ছে না,' বলল রানা। 'ডক্টর নাদিরা এখন আর তোমাদের কোনও অ্যাসেট নয়, লায়াবিলিটি। এটা তো ঠিক, বেঈমানি করা হয়েছে তোমাদের সঙ্গে, চুক্তি ভঙ্গ করেছে থাই টং। চক্রি চুয়ানকে খবর দাও, আমার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসুক সে। বনিবনা হলে আমি তোমাদের কাঁধের বোঝা হালকা করে দিতে রাজি আছি।'

'কী রকম?'

'ধরো কর্ণ থানমের ধারণাই ঠিক, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি,' বলল রানা। 'ডক্টর নাদিরা আমাদের অমূল্য একটা সম্পদ, যে-কোনও মূল্যে তাঁকে আমরা ফেরত পেতে চাই।' ওর কবজিতে চামড়া বলে কিছু থাকছে না, তবে এখনও ঢিল হচ্ছে বাঁধন। 'চক্রি চুয়ান বলুক বিনিময়ে কত টাকা চায় সে।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ধানাই ঠাকুর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সে অথরিটি তোমার আছে কি না বুঝব কীভাবে? কথার কথা বলছি, দুই আড়াই শো মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্যাশ দিতে পারা তো চাট্টিখানি কথা নয়।'

'হোটেল স্যুইটে আমার ক্রেডিট কার্ড আছে,' বলল রানা। 'প্রয়োজনে আরও বেশি টাকা ক্যাশ করতে পারব। তবে যে-কোনও আলোচনা চক্রি চুয়ানের সঙ্গে হতে হবে, অন্য কারও সঙ্গে নয়।' এত সব কথা সময় পাওয়ার জন্য বলছে ও।

‘বস্ খুব ব্যস্ত আছেন, এখনই তাঁকে পাওয়া যাবে না,’ বলল ধানাই ঠাকুর। ‘প্রাথমিক আলাপটা তুমি আমার সঙ্গে সেরে রাখতে পার। হোটেলের নাম বলো, তোমার স্যুইট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা নিয়ে আসুক আমার লোক।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘উঁহুঁ, আগে আমাকে চক্রি চুয়ানের সঙ্গে কথা বলতে হবে।’

‘তুমি মিথ্যুক, সময় পাওয়ার জন্যে ধোঁকা দিচ্ছ,’ খেপে উঠে বলল ধানাই ঠাকুর, ভোজবাজির মত তার হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এল। এই ছুরিটাই ডক্টর শামসুন্নাহারের গলায় চালিয়েছিল সে, তবে রানার তা জানার কথা নয়। ‘ভাবছ ব্যাকআপ এসে উদ্ধার করবে তোমাকে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। বাইরে আমাদের ব্যাকআপ সহ বহু লোক পাহারায় আছে, অচেনা কাউকে আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখলে ওখানেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।’

কর্ণ থানম বলল, ‘নন্দের আবার হুঁশ ফিরেছে।’

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা। কী করবে ধানাই ঠাকুর? ছুরির কাজটা আগে শেষ করবে, নাকি প্রথমে মুখ খোলাবার চেষ্টা করবে তিলসুলানন্দের?

এক পা পিছু হটল ধানাই ঠাকুর, তারপর ঘুরে নন্দের দিকে এগোল। রানাকে খুন করবার চেয়ে বাহকের কাছ থেকে তথ্য আদায় করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাঁধনের উপর শরীর ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিল রানা, তারপর আবার কবজি মুক্ত করবার কাজ শুরু করল।

‘প্রেম, তুমি আমাদের পুরানো বন্ধু,’ নরম সুরে বলল ধানাই ঠাকুর। ‘বিশ্বাস করো, তোমাকে আমরা ছেড়েই দিতে চাই। কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু একটা তো পেতে হবে, বলো? হয় টাকাগুলো ফেরত দাও, নয়তো এমন কিছু তথ্য দাও যাতে ওগুলো ফেরত পাবার ব্যবস্থা করতে পারি আমরা।’

‘কিন্তু কিছুই তো জানি না আমি!’ বিষণ্ণ সুরে বলল নন্দ, কোনও আশা দেখতে পাচ্ছে না সে।

‘ওদের আস্তানায় গিয়ে কী দেখলে তুমি?’

‘টেবিলে ডলারের বান্ডিল নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা,’ বলল নন্দ। ‘জিকো চেয়ার ছেড়ে হ্যান্ডশেক করল আমার সঙ্গে। দুজন লোক সুটকেসে বান্ডিলগুলো ভরতে শুরু করল। দুটো বান্ডিল টেনে নিয়ে পরীক্ষা করলাম আমি।’

‘বুঝতে পারলে ওগুলো জাল,’ বলল ধানাই ঠাকুর।

মাথা নাড়ল নন্দ। ‘না, তা বুঝিনি। আমার কোনও সন্দেহই হয়নি। হয়তো ওই বান্ডিল দুটো নকল ছিল না।’

‘তারপর? ওরা তোমাকে বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা সম্পর্কে কী বলল?’ জানতে চাইল ধানাই।

‘বলল টাকা নিয়ে এখানে পৌঁছেই আমি যেন ফোন করে ঠিকানাটা জানিয়ে দিই ওদেরকে, যে ঠিকানায় পাওয়া যাবে ডক্টর নাদিরাকে।’

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল ধানাই। ‘তুমি আসার পর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়েছে,’ বিড়বিড় করল সে। ‘কর্ণ, বাইরে আমাদের পাহারা আরও জোরদার করার ব্যবস্থা করো।’ মাথা ঝাঁকিয়ে বেযমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল থানম, নন্দের দিকে ফিরল ধানাই। ‘তারপর?’

‘আমাকে ওরা গাড়িতে তুলে পৌঁছে দিল অ্যাডাম পার্কের কাছে নির্জন এক রাস্তায়, একটা পাবলিক বুদের পাশে। ওরা চলে যাবার পর ওখান থেকে তোমাদেরকে ফোন করে এই সেফ হাউসের ঠিকানা জেনে নিই আমি। ওখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এখানে চলে আসি।’

‘পথে কোথাও থেমে সুটকেসটা বদল করেছ তুমি,’ বলল ধানাই।

‘কতবার বলব, না, করিনি!’ কেঁদে ফেলল নন্দ।

‘ঠিক আছে,’ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ধানাই ঠাকুর, রানার দিকে হেঁটে আসছে। ‘তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম।’

কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নন্দ, মাথা ঝাঁকাল, কৃতজ্ঞ।

বন করে নন্দের দিকে ফিরল ধানাই। ‘তবে তাতে তোমার খুশি হবার কিছু নেই,’ বলল সে। ‘তোমাকে আমার বাঁচিয়ে রাখার কী কারণ থাকতে পারে বলো!’

‘না, ঠাকুর!’ নন্দ আবার কেঁদে ফেলল, ‘কোনও কারণ নেই।’

ঘুরে রানার দিকে তাকাল ধানাই ঠাকুর। এই সময় আবার কথা বলে উঠল হাল ছেড়ে দেয়া মৃত্যুপথযাত্রী।

‘ঠাকুর!’ চুলো ও মশালের কাঁপা কাঁপা আলোয় ভৌতিক শোনাল নন্দর করুণ আবেদন। ‘আমি ওদের কাছে ফিরে যাব। জানতে চাইব এই কাজ কেন ওরা করল...’

নন্দকে আর গ্রাহ্যই করছে না ধানাই ঠাকুর, সে যেন এক পিস ফার্নিচার। ‘এখানে আমরা টাইম কিল করার কোনও খেলা খেলছি না, মাসুদ রানা,’ বলল সে। ‘হোটেলের নাম বলো, ক্রেডিট কার্ডটা এখনই চাই আমার!’

কথাটা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে থাই থান্ডারের সহকারী বস্ ধানাই ঠাকুর বন করে আধপাক ঘুরল, ওয়ালথার তুলে লক্ষ্যস্থির করল, তারপর টিপে দিল ট্রিগার। কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে তার সঙ্গীরা। কর্ণ থানম নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে।

ছুরিটা ঝাঁকিয়ে হাতের তালুতে নিয়ে এল রানা।

বিস্ফোরিত হলো তিলসুলানন্দের মাথা; হাড়, মাংস ও রক্ত ছড়িয়ে পড়ল ঠাণ্ডা বেযমেন্ট গর্তগুলোয়। টেবিলের সঙ্গে রশিতে বাঁধা শরীরটা ঝাঁকি খেল বারকয়েক, তারপর স্থির হয়ে গেল।

‘দেখলে, মাসুদ রানা,’ লাশটার দিকে চোখ রেখে সহাস্যে বলল ধানাই ঠাকুর, ‘আমাদের কাজে না লাগলে তাকে নিয়ে কী

করি আমরা?'

তালুর উপর ছুরিটাকে ঘুরিয়ে নিল রানা, কবজি বেঁধে রাখা রশিটা কাটছে। 'আমি আতংকিত,' বলল ও।

ওর দিকে এগিয়ে এল ধানাই ঠাকুর, ঠাণ্ডা রাগে অপলক হয়ে আছে চোখ, উল্টো করে ধরা পিস্তল তুলল আঘাত করবার জন্য।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ধানাই ঠাকুর। দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। বেযমেন্টে পিন-পতন নীরবতা নেমে এল। থাই থান্ডার সদস্যরা ভ্রূ কুঁচকে পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাচ্ছে।

'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?' নীরবতা ভাঙল রানা। 'তোমাদের বাহকের পিছু নিয়ে পৌঁছে গেছে থাই টং।'

'তাতে কী?' হাসল ধানাই, চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। 'আমরা কি ভাবিনি এরকম কিছু ঘটতে পারে? আমাদের চল্লিশজন লোক পাহারা দিচ্ছে এই সেফ হাউস। সবাই তারা সশস্ত্র মার্সেনারি।'

আরও কয়েক মিনিট কাটল। গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ কাছে সরে আসছে। ধীরে ধীরে নার্ভাস হয়ে উঠছে থাই থান্ডার। আরও দু'মিনিট পর থানমকে বাইরেটা দেখে আসবার জন্য পাঠাল ধানাই।

তার আর দরকার হলো না। বাইরে থেকে অকস্মাৎ একটা চিৎকার ভেসে এল। 'চারদিক ঘিরে ফেলেছে... আমাদের দুই কাতারের প্রায় সব গার্ড নিশ্চিহ্ন হয়ে...' পর মুহূর্তে যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে।

তারপরেই চারপাশে শুরু হয়ে গেল তুমুল গোলাগুলি। পাথুরে দেয়ালে লেগে দিক্‌বিদিক্ ছুটে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। ধানাই ঠাকুরের এক সঙ্গী ঢলে পড়ল, তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

চোদ্দো

তিন থাই ও রানার চারদিকে ছুটোছুটি করছে বুলেটগুলো। ধানাই আর তার দুই সঙ্গী ভেঙে পড়া পাথুরে দেয়ালের স্তূপে গা ঢাকা দিয়েছে। সিলিঙের গর্ত ও সিঁড়ি লক্ষ্য করে গুলি করছে তারা।

রশির বাঁধনে দ্রুত ছুরি চালিয়ে হাত দুটো মুক্ত করল রানা, তারপর বাকি রশি কাটায় মন দিল। পিছনের দেয়ালে গুলি লাগার আওয়াজ পাচ্ছে ও।

'কোথায় বিজ্ঞানী?' কারও চিৎকার ভেসে এল বেযমেন্টে। ভাষাটা চিনা, তবে থাই টান স্পষ্ট। 'ভাল চাও তো এই মুহূর্তে তাকে আমাদের হাতে তুলে দাও।'

'টাকার বিনিময়ে পেতে হবে তাকে!' ধানাই ঠাকুরও গলা চড়িয়ে জবাব দিল। 'আমরা কারও বেগার খাটি না।'

'ব্যাপার তা হলে এখনও টের পাওনি? বাইরে তোমাদের পাহারাদাররা লাশ হয়ে পড়ে আছে,' বেযমেন্টের উপরদিক থেকে জবাব ভেসে এল। 'কয়েকজন পালিয়েছে, তবে আমাদের লোক ধাওয়া করছে তাদের, প্রত্যেকের ব্যবস্থা করে তবেই ফিরবে। এই সেফহাউসে হেরে ভূত হয়ে গেছ তোমরা।'

লোকটা থামতেই হেসে উঠল ধানাই ঠাকুর। তারপর বলল, 'আমাদের কাছেও খবর আছে, পড়ে থাকা লাশের অর্ধেকের

বেশি তোমাদের লোক। একটু পর টের পাবে কারা হেরেছে, আমাদের আরও একটা গ্রুপ পৌঁছাল বলে! ডক্টর নাদিরা? টাকা না দিলে তাকে পাবার আশা ভুলে যাও।'

'চুক্তি হয়েছিল দশ মিলিয়নে, সেই চুক্তি ভেঙে বিশ মিলিয়ন চেয়ে বসলে তোমরা। নিয়েও গেছো বিশ মিলিয়ন!' উপর থেকে অভিযোগ ভেসে এল। 'এরপর আর কথা কী!'

'মো পাইয়ের মধ্যস্থতায় তোমাদের জিকো তানাইয়ের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি চিত্রলেখার চুক্তি হয়েছে, আরও পাঁচ মিলিয়ন দিতে হবে। জাল নোট পাঠিয়ে সেই চুক্তির বরখেলাপ করেছ তোমরা।'

'মো পাই খুন হবার পর ওই চুক্তি মেনে চলতে আমরা এখন আর বাধ্য নই,' থাই টং-এর লোকটা বলল। 'টাকা যা দেয়ার দিয়েছি, ভাল চাও তো বিজ্ঞানীকে আমাদের হাতে তুলে দাও।'

'তাকে পেতে হলে আরও পাঁচ দিতে হবে,' জানিয়ে দিল ধানাই ঠাকুর। 'তোমরা না দিলে অন্য পার্টি দেবে।'

আবার দু'পক্ষ থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

নিজেকে রানা মুক্ত করে ফেলেছে।

বোঝাই যাচ্ছে যে বাহকের পিছু নিয়েই থাই টং পৌঁছে গেছে থাই থান্ডারের সেফ হাউসে। থাই টং-এর সঙ্গে নন্দ হাত মিলিয়ে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, ভাবল রানা। থাই টং-এর বিশ্বাস আর কোনও টাকা না দিয়েই বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে যেতে পারবে তারা।

কিন্তু কীভাবে? ভাবছে রানা। ডক্টর নাদিরাকে কোথায় রাখা হয়েছে কে জানে!

হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে রানা, অপেক্ষা করছে কতক্ষণে রক্তচলাচল স্বাভাবিক হয়। সারা শরীর ব্যথা করছে ওর। তবে মাথাব্যথা কমতে শুরু করেছে।

আরও দুজন থাই থান্ডার মারা গেল। কাঁধ ও গলায় বুলেট

খেয়ে থানম, কপাল ফুটো হয়ে তার সঙ্গী। রানা ও ধানাই এক কোণে আটকা পড়েছে।

রানা বুঝল, বাঁচতে হলে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে ওকে। ছুরিটা খাপের ভিতর রেখে দিয়ে ক্রল করে এগোল ও।

ঘাড় ফেরাল ধানাই, রানার মাথা লক্ষ্য করে সাব-মেশিন গান তুলল।

'বোকামি করো না!' হিসহিস করে ধমক দিল রানা। 'ওয়ালথারটা ফেরত দাও আমাকে!'

হঠাৎ একঝাঁক বুলেট ছুটে এল উপরদিক থেকে। লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে থাই টং হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে দখল করে নেবে বেযমেন্ট, অন্তত সম্ভাবনাটা অস্বীকার করতে পারছে না ধানাইও। পিস্তলটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'ওরা আমাদেরকে জ্যান্ত ধরবে, সেটি হতে দিচ্ছি না!' চাপাস্বরে বলল।

সিঁড়ির মাথা থেকে একটা লোক উঁকি দিচ্ছিল, পিস্তল তুলেই ফায়ার করল রানা। দড়াম করে পড়ল লোকটা মেঝেতে, চোখের জায়গায় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে।

'তুমি একট বুদ্ধু,' ধানাইকে বলল রানা। 'খুন-খারাবি শিখেছ, মাথায় এক ছটাক বুদ্ধিও রাখো না।'

'এই, চুপ!' চোখ গরম করল ধানাই ঠাকুর, 'খবরদার!'

'তুই চুপ কর্, ব্যাটা গর্দভ!' হিসহিস করে বলল রানা। 'গর্দভ না হলে কেউ মরতে চায়? মরতে চাওয়া মানে তো হেরে যাওয়া!' তারপর, অপ্রত্যাশিতভাবে, গলা চড়িয়ে থাই টং-এর উদ্দেশে বলল, 'তোমরা ফায়ার বন্ধ করলে বলব কোথায় আছে বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা!'

হঠাৎ করে ভৌতিক নীরবতা নেমে এল বেযমেন্টে।

'কো-ক্কোথায় তিনি?' অবশেষে জানতে চাইল কেউ একজন, লোকটা সম্ভবত তোতলা।

ধীরে ধীরে ঘুরে গেল ধানাই ঠাকুর। রাগে চোখ দুটো জ্বলছে। রানার দিকে সাবমেশিন গান তুলল সে।

মাথা নাড়ল রানা, চোখে-মুখে বিরক্তি। 'বোঝার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। মুক্তিপণের টাকা আমার সরকারই দেবে। এমনকী, আমি বললে হয়তো থাই টঙের চেয়ে বেশিও দিতে পারে।'

ধানাই ঠাকুরের চোখে-মুখে রহস্যময় একটা হাসি ফুটল। বলল, 'ভেবো না থাই টং ছাড়া বাংলাদেশই একমাত্র পার্টি। বেইজিং-এর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি আমরা। বেইজিং বলছে ডক্টর নাদিরার নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের একটা দায়িত্ব আছে। দুশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার চাওয়া হয়েছে।'

রানার জন্য এটা একটা নতুন তথ্য। বোঝা গেল কী কাজে ব্যস্ত চক্রি চুয়ান। হাসল ও। 'তোমাদের তো জানার কথা যে লাল চিন কখনও ব্ল্যাকমেইলিঙের কাছে নতি স্বীকার করে না। ওরাও হয়তো থাই টঙের মত বিজ্ঞানীকে সুযোগ মত তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার কথাই ভাবছে।'

অন্যমনস্কতার ভান করে চুপ করে থাকল ধানাই।

আবার গলা চড়াল রানা। 'আমাদেরকে ওপরে উঠতে দাও,' বলল ও। 'আলোচনা শুরু হোক।'

উপরে কয়েকটা কণ্ঠস্বর ফিসফাস করছে। রানার দিকে নতুন আগ্রহ নিয়ে তাকাল ধানাই ঠাকুর। 'এতে কাজ হবে?'

'সবকিছু সম্ভব। তুমিও জানো।'

নিহত সঙ্গীদের পড়ে থাকা লাশগুলো দেখল ধানাই। 'তোমার আইডিয়াটা বোধহয় মন্দ নয়।'

'বিজ্ঞানী কোথায় বলো আমাকে,' বুদ্ধি দিল রানা। 'তারপর দুজন মিলে এমন একটা মিথ্যে গল্প বানাই এসো, ওরা যাতে বিশ্বাস করে।'

চোখ দুটো সরু করল ধানাই। 'আমাকে তুমি সত্যিই বুদ্ধু

ভাবলে ভুল করবে, মিস্টার। ওটাই আমার ইনফরমেশন। ওটা পেতে হলে আগে তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে।'

শ্রাগ করল রানা। এই ফাঁদ থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। সঙ্গে যদি ধানাই আর তার তথ্যটা নিতে পারে, দারুণ হয়।

'কী বলো তোমরা?' ভাঙা পোড়োবাড়ির উপর দিকে মুখ তুলে গলা চড়াল রানা।

'ঠিট্-ঠিক আছে,' জবাব দিল তোতলা। 'নিজেদের অস্ত্র ফেলে দাও। মা-ম্মাথার ওপর হাত তুলে আড়াল থেকে বে-ব্বেরিয়ে এসো।'

বেসুরো গলায় হেসে উঠল ধানাই ঠাকুর। 'বাহ্! আমরা বেরুই, আর তোমরা গুলি করে ফেলে দাও আরকী! না, উঁহুঁ, সেটি হবে না! তোমাদেরকেও নিরস্ত্র হতে হবে।'

'কাউকে আমরা গুলি করব না,' উপর থেকে প্রতিশ্রুতি দিল থাই টঙের প্রতিনিধি। 'বিশেষ করে তোমাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার দরকার আছে, ধানাই ঠাকুর। কারণ বিজ্ঞানী বুড়ি তোমাদের সঙ্গে এখানে যদি না থাকে, কোথায় আছে তা তোমার কাছ থেকেই জানতে হবে আমাদেরকে।'

'জানাচ্ছি,' বিড়বিড় করল ধানাই ঠাকুর, মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্রগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে। বলল, 'অস্ত্র ফেলবে কি না বলো। না ফেললে কোনও সমঝোতা নয়। আর আমাদের মত তোমাদেরও মাথার ওপর হাত তুলে রাখতে হবে।'

কয়েক মুহূর্ত পর জবাব ভেসে এল, 'ঠিক আছে, রাজি।'

জ্যাকেটের ভিতর বিশেষভাবে প্যাড লাগানো পকেটে ওয়ালথারটা ভরে রাখল রানা, এটা ড. শামশের আলীর নির্দেশে বিসিআই টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের তৈরি, খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝা যাবে না ওখানে ওটা আছে।

মেঝে থেকে একটা .45 তুলে নিল ধানাই, জিনসের

ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে রাখল। তারপর ওটার উপর ভারী জ্যাকেট চাপা দিল।

'তোমার টেসটিকল আবার না উড়ে যায়,' বলল রানা।

হেসে উঠে সিঁড়ির দিকে এগোল ধানাই, হাত তুলে চোখে ঠিকমত বসিয়ে নিচ্ছে চশমাটা। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার বিপদটা রোমাঞ্চিত করছে তাকে।

ঠাণ্ডা বাতাসের ভিতর দিয়ে তার পিছু নিল রানা, ধানাই ঠাকুরের মত ওর হাতও মাথার উপর তোলা।

রাতের অন্ধকারে ছ'জন থাই চিনা মাথার উপর হাত তুলে অপেক্ষা করছে। আলো বলতে নীচের বেযমেন্টের নিভু নিভু তিনটে মশাল ও চুলোর লালচে আভা, আর মাথার উপর কালো চাদরে গাঁথা আধখানা চাঁদ, তাও ঝুলে থাকা গাছপালার আড়ালে খানিকটা লুকানো।

লোকগুলোর মুখ ছায়ায় ঢাকা। তাদের পরনের গাঢ় রঙের বিজনেস সুট অশুভ লাগছে দেখতে, কারণ একটা আরেকটার কার্বন কপি।

'কো-ক্কোথায় বিজ্ঞানী?' জানতে চাইল তোতলা লোকটা, অকস্মাৎ হাত নামিয়ে ফেলল সে, ডান হাতে ভোজবাজির মত বেরিয়ে এল একটা ল্যুগার। সেটা পালা করে রানা ও ধানাইয়ের দিকে ঘোরাচ্ছে।

'খুব ভাল জার্মান গান,' মন্তব্য করল রানা।

'তোমরা সমঝোতা চুক্তির বারোটা বাজিয়েছ,' তোতলা থাই চিনার দিকে তাকিয়ে অভিযোগ করল ধানাই ।

'চোপ শালা শু-শুয়োরের বাচ্চা! বি-বিজ্ঞানী কোথায় বল্, তা না হলে এখনই খুন হয়ে যাবি।'

অপমানটা সহ্য হলো না ধানাই ঠাকুরের। তাকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখল রানা, দেখল তার হাত জ্যাকেটের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

‘দু’মুখো সাপের সঙ্গে আমি ব্যবসা করি না!’ বলেই .45-টা বের করে ফেলল ধানাই।

ঝুঁকে তোতলার পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল রানা।

আরেক থাই চিনাকে গুলি করল ধানাই। ওটাই সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ ও কাপুরুষের পছন্দসই টার্গেট প্র্যাকটিস ছিল।

থাই চিনা পড়ে গেল। দ্রুত তাকে আরও একটা গুলি করল ধানাই।

নিজের চোখে-মুখে নিহত লোকটার রক্তের ছিটা অনুভব করল রানা। পরমুহূর্তে দ্রুত পা চালাল অন্ধকারের দিকে। কামরা থেকে বেরিয়েই এঁকেবেঁকে ছুটল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।

ওর পিছনে বাকি থাই চিনাদের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঝাঁঝরা করছে ধানাই ঠাকুরের দুই পা। এরকম বিপদের সময়ও নিজেদের স্বার্থের কথা ভোলেনি থাই টঙের সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতে পারে, এমন কোথাও গুলি করছে না তারা।

কয়েক মুহূর্ত পর একটা বিরতি। তারপর চিৎকার-চেঁচামেচি, যেন চোর পালাবার পর বুদ্ধি বেড়েছে।

রানা কোন্‌দিকে গেছে তা নিয়ে সম্ভবত ওদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিল। দু’দলে ভাগ হয়ে জঙ্গলের দু’দিকে রওনা হলো ওরা। দু’মিনিট একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকার পর তৃতীয় আরেকদিকে ছুটল রানা। কমকরেও আট-নয়টা লাশ টপকাতে হলো ওকে।

মিনিট দশেক হনহন করে হাঁটবার পর একটা ঢাল পেল রানা, ওটার মাথা থেকে নেমে এল পাকা রাস্তায়। সাইরেন বাজিয়ে কয়েকটা পুলিশ কারকে ছুটে যেতে দেখল ও। উল্টোদিকে আরও দশ মিনিট হাঁটার পর একটা ট্যাক্সি পেল।

ম্যাকমোহন পার্কের পার্কিং লটে রেন্ট-আ-কার কোম্পানির

টয়োটা স্প্রিন্টারটা রেখে গিয়েছিল রানা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল ওর গাড়ির পাশে কলাপাতা রঙের অস্বাভাবিক চকচকে একটা পোর্শ রয়েছে। গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে মুগ্ধ চোখে দেখছে।

তালা খুলে নিজের টয়োটায় ঢুকল রানা। দরজা বন্ধ করে সিটের সাইড পকেট থেকে রেডিওটা বের করল, দেখতে ঠিক যেন সাধারণ একটা টেপ প্লেয়ার। কানে এয়ারফোন ঢোকাল, চাপ দিল কয়েকটা বোতামে, তারপর হেলান দিল সিটে। স্যাটেলাইট ইলেকট্রনিক্সের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে।

'ইয়েস, এমআরনাইন,' বিসিআই চিফ রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে।

'সার,' কোনও ভূমিকা না করেই রিপোর্ট করছে রানা। 'ইমরুলকে যে গুলি করেছিল সে নেই। এই অপারেশনের সঙ্গে তাইওয়ানিজ টংও জড়িত, ওদের চিফও নেই।'

কোনও মন্তব্য না করে অপরপ্রান্তে অপেক্ষা করছেন বিসিআই চিফ।

'দোই ইনথানন দুর্গে তেরপল ঢাকা একটা জেট প্লেন দেখেছি,' বলল রানা। 'কিন্তু সেটা আমাদের দুরন্ত ঈগল কি না জানার সুযোগ হয়নি আমার।'

'এয়ারপোর্টের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, ওটাই পুড়েছে আগুনে,' বললেন রাহাত খান। 'দুরন্ত ঈগল আকাশে ওঠেনি, উঠেছিল দ্বিতীয় প্লেনটা। তর্কের খাতির যদি ধরে নেয়া হয় যে দুরন্তই আকাশে উঠেছিল, তা হলেও পরিস্থিতি বদলাচ্ছে না। কারণ, কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বলা হচ্ছে ওই ঈগল ঢাকার আকাশ ছেড়ে কোথাও যায়নি। তবে একটা কথা।'

‘ইয়েস, সার!’

‘কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ পেয়ে যে তিনজন চিনা ক্রু বি সেকশনের ঈগল নিয়ে আকাশে উঠেছিল, ওদের সম্পর্কে একটা রহস্যময় রিপোর্ট পাওয়া গেছে।’

কথা না বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রানা। ওর জানা আছে, এই তিন চিনা ক্রুর কোনও হদিসই পাওয়া যাচ্ছিল না।

‘এয়ারপোর্টের বাইরে কোথাও থেকে একটা হেলিকপ্টারে চড়ে ওরা,’ বললেন রাহাত খান। ‘ওটা ওদেরকে টেকনাফে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে বোট নিয়ে একটা জাহাজে উঠে চলে গেছে ওরা। কেউ বলতে পারছে না কেন ওরা এরকম অদ্ভুত আচরণ করল। আমি খবর রাখছি, এখন পর্যন্ত চিনেও ওরা পৌঁছায়নি। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে দুর্বোধ্য কী যেন একটা গোলমাল আছে।’

‘জী, সার,’ বলল রানা।

‘আরেকটা কথা,’ বললেন রাহাত খান। ‘গালকাটা রুস্তম নামে এক ক্রিমিনাল ধরা পড়েছে। ইন্টারোগেশন চলছে। স্বীকার করেছে থাই থান্ডারের দুটো গ্রুপকে ও-ই এয়ারপোর্ট থেকে বের করে আনে। তাদের কয়েকজনের নামও বলেছে ও।’

নামগুলো জেনে নিল রানা। তারপর বলল, ‘সার, আমি তা হলে...

‘এই মুহূর্তে দুরন্ত বড় কোনও ইস্যু নয়,’ রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন রাহাত খান। ‘মূল ইস্যু বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা। আমার কাছে আজই খবর এসেছে, থাই থান্ডার বেইজিঙের কাছ থেকে দুশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার মুক্তিপণ চেয়েছে। বলেছে, মুক্তিপণ না দিলে ডক্টর নাদিরাকে ওরা অন্য কোনও প্রতিপক্ষের কাছে বেচে দেবে।’

‘ক্রিমিনালদেরও একটা নীতি থাকে, ওরা তা মানছে না,

সার,’ বলল রানা।

‘তোমার বন্ধু লিউ ফুচুং আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল,’ বললেন বিসিআই চিফ। ‘আসলে খুঁজছিল তোমাকে। ও বলছে, এই ব্যাপারটায় কয়েকটা পার্টি জড়িত, ফলে ফিল্ডে তোমাকে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বলল, তোমার কল পাবার অপেক্ষায় তৈরি হয়ে আছে ও।’

‘জী, সার।’

‘চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের তরফ থেকে ফুচুং তোমাকে একটা পোর্শ কার গিফট করেছে,’ বললেন রাহাত খান। ‘ওর ধারণা, বিশেষ করে এই অ্যাসাইনমেন্টে তোমার নাকি লাগতে পারে ওটা। আমি ওকে বলেছি – যেহেতু কারও কাছ থেকে গিফট নেওয়ার কোনও নিয়ম নেই, কাজ শেষ হয়ে গেলে ওটা তুমি ওকে ফেরত দেবে।’

‘জী, সার।’

‘ম্যাকমোহন পার্কের পার্কিং লটে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে ওটা,’ বললেন রাহাত খান।

রানা অবাক। মাথা ঘুরিয়ে টয়োটার পাশে পার্ক করা পোর্শ কারটার দিকে তাকাল ও। কাকতালীয় একটা ব্যাপার, সন্দেহ নেই। ‘জী, সার।’

‘গাড়িটার কিছু টেকনিকাল বৈশিষ্ট্য আছে, বুকলেট দেখে জেনে নিয়ো কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।’

‘জী, সার।’

‘গুড হান্টিং, মাই বয়!’ বলেই যোগাযোগ কেটে দিলেন বিসিআই চিফ।

পনেরো

বিগ ডিল ক্যাসিনোর ফাইল থেকে পাওয়া ঠিকানায় পৌঁছাতে চাইছে রানা। দুই ব্লক আগে পোর্শ থামাল, বাকি পথ হেঁটে এগোচ্ছে।

সাজানো-গোছানো এলাকা, ধনী মানুষদের বসবাস। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে বাগান ও লন। বহুতল ভবনগুলো আকাশ ছুঁয়েছে। রাস্তায় জটলা নেই, দোকান-পাট নেই। হাস্যোজ্জ্বল টিন-এজ ছেলেরা তীরবেগে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে, পিছন থেকে তাদেরকে জড়িয়ে ধরে খিলখিল করছে মিনি স্কার্ট পরা সুন্দরী সিঙ্গাপুরী মেয়েরা।

রাস্তার ধারে পার্ক করা গাড়িগুলো বেশিরভাগই মার্সিডিজ, পাজেরো বা বিএমডব্লিউ। এগুলোর মাঝখানে দৃষ্টিকটু লাগল উইন্ডো ওয়াশার-এর একটা তোবড়ানো ট্রাক।

ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আটতলা একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের দিকে, ওর সংগ্রহ করা ঠিকানার সঙ্গে মেলে। বিল্ডিংটার চারতলার বাইরে, বাঁশের তৈরি মাচার উপর দাঁড়িয়ে, এক লোক ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে জানালার কাঁচ পরিষ্কার করছে।

বাড়িটার গেটের পাশে একটা টুল দেখে বোঝা গেল ওখানে দারোয়ান বসে, তবে এই মুহূর্তে সে অনুপস্থিত। ঢুকে পড়ল রানা। এলিভেটরকে পাশ কাটিয়ে মোজাইক করা ঝকঝকে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠছে ও।

প্রতিটি ফ্লোরে একটা করে করিডর, দু'পাশে কয়েকটা করে ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্লোরের সব দরজা বন্ধ দেখছে রানা। করিডরে

কেউ নেই, ফ্ল্যাটগুলো থেকে কোনও রকম আওয়াজও আসছে না।

ফাইভ-সি অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজছে ও। চারতলায় ওটা পেয়ে গেল ও, সার্ভিস লিফট চেক করল। চালু আছে ওটা, বোতাম টিপলেই হাজির হবে এসে। দ্রুত পলায়ন করতে হলে সুবিধে হবে ভেবে কল-বাটনে চাপ দিল ও।

তারপর রওনা হলো করিডর ধরে। শেষ অ্যাপার্টমেন্টটাই ফাইভ-সি। ফাইভ-এ থেকে সুন্দরী এক চিনা তরুণী দরজা খুলে বেরুতে যাচ্ছিল, রানাকে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দাঁড়ানো কাকে যেন কী বলল। মেয়েটির কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে রানার দিকে তাকাল তার শ্বেতাঙ্গ সঙ্গী। রানাকে চোখে-মুখে রক্তের ছিটে নিয়ে ফাইভ-সির দিকে এগোতে দেখে তারা যেন খুব অবাক হয়েছে।

আবার যখন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল মেয়েটি। ফাইভ-সির সামনে থেমে কান পাতল ও। কোনও শব্দ পাচ্ছে না। দরজার কবাটে কান ঠেকাল। না, কিছু শোনা যাচ্ছে না। এরপর নক করল।

ফাইভ-এ থেকে আবার উঁকি দিল সেই তরুণী। এবার মেয়েটিকে আরও বেশি ইতস্তত করতে দেখল রানা। তার মাত্র একটা চোখ দেখা গেল, তারপরই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল কবাট।

দরজার কী হোলে টুথপিক ঢোকাল রানা। একটু পর ক্লিক করে শব্দ বেরুল ওটা থেকে। একপাশে দাঁড়িয়ে কবাট খুলল ও।

অ্যাপার্টমেন্টটা অন্ধকার। তবে ভিতর থেকে ভ্যাপসা গুমোট কোনও ভাব এসে মুখে লাগল না। হাতে পিস্তল নিয়ে সাবধানে ঢুকল রানা, দরজা বন্ধ করে টর্চ জ্বালল, আলোটা কামরার চারদিকে ঘোরাচ্ছে।

দামি সোফার সামনে কফি টেবিল, তাতে খোলা কয়েকটা ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে, পাঠকরা যেন যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসবে। টেবিলে কফি পট ও তিনটে কাপ রয়েছে, প্রতিটি প্রায় অর্ধেক ভরে আছে কফিতে। পুরানো একটা ফ্লোর রেডিও থেকে ক্ষীণ আভা বেরুচ্ছে।

পাশের কামরায় তাড়াহুড়ো করে ওয়ার্ড্রোব থেকে কাপড়চোপড় বের করবার পর সব আবার তোলা হয়নি, কিছু পড়ে আছে মেঝেতে। টেবিলের দেরাজগুলো খোলা, ভিতরের জিনিস-পত্র এলোমেলো করা। বাকি কামরাগুলোরও একই অবস্থা, চারদিকে কসমেটিকস ছড়িয়ে আছে। কী যেন খুঁজেছে কেউ হন্যে হয়ে।

প্রথম কামরায় ফিরে এসে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলল রানা, তারপর বাইরে মাথা বের করে উইন্ডো ওয়াশারকে হিন্দি ভাষায় বলল, 'এই যে মামাতো ভাই, এখানে কী?'

'আরে, আপনি!' ওকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লোকটা, কথা বলছে হিন্দিতেই। 'আপনি... দেবতুল্য মানুষ! নমস্তে, সার! সেলাম, হুজুর!'

'সালাম,' বলল রানা, খর্বকায় পকেটমারের দিকে তাকিয়ে হাসল। সাদা শার্টের সঙ্গে বো টাই পরেছে এখন। 'গরম এক কাপ কফি চলবে নাকি? চললে ভেতরে ঢুকে পড়ুন।'

রানা ওকে আপনি করে বলছে দেখে খুশি হওয়ার বদলে ভ্রূ কোঁচকাল পকেটমার। তারপর হাতের কাজ থামিয়ে মাচার উপর পাঁচ সেকেন্ড বসে থাকল। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল। সাবধানে জানালার গোবরাটে পা দিয়ে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল সে।

'হাসপাতাল থেকে এরইমধ্যে বেরিয়ে এসেছেন?'

'জখম খুব একটা গুরুতর ছিল না, সার। ওরা আর মারতে পারল কই, আপনি বাধা দিলেন না! দু'ঘণ্টা পর জানালা গলে

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম।'

'কেন?' রানা অবাক।

'ওরা থাই থান্ডার, একবার যখন চিনেছে, সহজে আমাকে ছাড়বে ভেবেছেন?' বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে চুপ করে গেল লোকটা।

তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস?' জানতে চাইল ও।

'কী করে বুঝলেন, সার?'

'সন্দেহটা মাথায় আসে বিগ ডিলে যখন আপনি আমার পকেট মারলেন,' বলল রানা। 'ওই কাজে আপনি মোটেও ভাল না। গিল্টি মিয়া নামে একজন হাতসাফাইয়ের ওস্তাদ আছে, সে হলে কিছু টেরই পেতাম না। বোঝা যায় যে এটা আপনার পেশা নয়।'

রানাকে অবাক করে দিয়ে রানার কথা মেনে নিল লোকটা, 'আপনি ঠিক ধরেছেন, সার! কাজটায় এখনও তেমন হাত পাকাতে পারিনি। অধমের নাম মানস ঘোষ।' জুতোর গোড়ালি পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে মাথা নোয়াল সে।

'মাসুদ রানা।'

'ওহ্? মাইরি বলছি, দাদা, এ তো স্বপ্নেও কখনও আশা করিনি! স্বয়ং মাসুদ রানা আমার সামনে দাঁড়িয়ে! আমার হিরো! আমার আইডল! মা দুর্গা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ!'

রানাকে আরও খানিক বিব্রত করল মানস, দ্বিতীয়বার হ্যান্ডশেকে বাধ্য করে।

অবশেষে কথাটা তুলল রানা। 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'জে-আজ্ঞে, বলুন না।' বিনয়ের অবতার সাজল মানস ঘোষ। 'আপনার কথা, সে কী অমৃতবচন না হয়ে যায়!'

'আপনাকে আমার অত্যন্ত অভিজ্ঞ আর দক্ষ একজন

এসপিওনাজ এজেন্ট বলে মনে হয়েছে,' বলল রানা। 'অথচ এই যে সারাক্ষণ নাটুকেপনা, অতিরিক্ত গদগদ ভাব, এটা কেন?'

রানা ভেবেছিল লোকটা অপমান বোধ করবে। কিন্তু তার বদলে হাসল সে। 'আসল কথাটা তা হলে বলেই ফেলি, হুজুর। এই দেখুন, আবার মুখ দিয়ে হুজুর বেরিয়ে গেল! হয়েছে কী, এটা আমার অনেক পুরানো একটা অভ্যাস, সেই ছোটবেলার। সিক্রেট সার্ভিসে ঢোকার পর ট্রেনাররা বলল, নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে এই অভ্যাসটা তুমি ধরে রাখতে পার। ব্যাপারটা আমার মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে, চাইলেও ছাড়তে পারি না।'

'ও। তা হলে তো আর কিছু করার নেই,' বলে কাজের কথা পাড়ল রানা। 'প্রতিটি কামরা এলোমেলো হয়ে আছে। আপনার কাজ?'

মাথা ঝাঁকাল মানস ঘোষ। 'তবে নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছিলাম, তা নয়,' বলল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জানালা খুলে বাইরে তাকাবার কথা মনে হলো কেন?'

'সাধারণত এই কাজ রাতে কেউ করে না।'

'আরে, তাই তো!' কপালে চাঁটি মারল মানস। 'নীচের রাস্তায় পার্ক করা একটা ট্রাকে গিয়ারগুলো দেখে ভাবলাম ফ্ল্যাটটায় তল্লাশি চালাবার জন্যে ভাল একটা কাভার পাওয়া গেছে।' হাসল সে। 'আপনি ছাড়া আর কেউ প্রশ্ন করেনি, বুঝলেন না।'

'আর কেউ আসলে গ্রাহ্য করেনি,' বলল রানা। 'আসুন, আমরা নোট বিনিময় করি। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'কী বলেন, সার, কীসের আপত্তি!'

'আপনি আমার পকেট মারতে গেলেন কেন?'

'দেখামাত্র ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে পারলাম, আমার লাইনের লোক। ভাবলাম জেনে রাখা ভাল কে আপনি। মানিব্যাগকে তথ্যের ভাণ্ডার বলা যায়।'

‘এখানে আপনি কী করছেন?’

‘মাস ছয়েক আগে ব্যাংককে থাই থান্ডারের এক সদস্যের সঙ্গে আমার গোলমাল বেধেছিল। তার নাম ধানাই ঠাকুর। গত শুক্রবার রাতে তেনগাহ্ এয়ারপোর্ট থেকে একটা অ্যামবুলেন্সে চড়ে তাকে বেরুতে দেখেছি আমি।’

রানা ধারণা করল, ওই অ্যামবুলেন্সে নিশ্চয়ই ডক্টর নাদিরা ছিলেন। ‘আপনি ফলো করেননি?’

‘দাদা, তখন কি আর জানি যে কী ঘটে গেছে!’ ম্লান হেসে মাথা নাড়ল মানস। ‘তবে কাল আবার আমি ধানাইকে দেখতে পাই বিগ ডিলে। গভীর রাতে ফলো করে এই সেফ হাউসটা দেখে যাই। কিন্তু আজ এসে দেখি চিড়িয়া উড়ে গেছে।’

‘হ্যাঁ, একেবারে দুনিয়া ছেড়ে,’ বলল রানা। ‘ঘণ্টা দুই আগে থাই টং তাকে খুন করেছে।’

‘বলেন কী, দাদা!’ হাঁ হয়ে গেল মানস। তারপর বলল, ‘ভয়ানক নিষ্ঠুর লোক ছিল, কাজেই তার চলে যাওয়ায় দুনিয়ার কোনও ক্ষতি হলো না।’

‘এসে দেখলেন চিড়িয়া ভেগেছে,’ বলল রানা। ‘তারপরও মাচায় বসে কী করছিলেন?’ ভ্রূ কোঁচকাল ও।

হেসে উঠল মানস। ‘তল্লাশি শেষ করে আমার তো চলে যাবারই কথা, বুঝলেন না। ভাবলাম আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখি কেউ আসে কি না। কারণ আমি জানি ওদের পেছনে থাই টং লেগেছে।’

‘কী করে জানলেন?’

‘আপনি তো জানেনেই, প্রতিবেশী সব দেশে আমাদের এসপিওনাজ নেটওঅর্ক আছে,’ বলল মানস। ‘সে-সব নেটওঅর্ক থেকে যে-সব রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে তা থেকে আমাদের সিক্রেট সার্ভিস পুরো ছবিটাই পেয়ে গেছে।’

‘কী রকম?’

‘যেমন আমরা জানি বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে ঢাকা থেকে হাইজ্যাক করেছে থাই থান্ডার। জানি এই কাজে কয়েকটা পার্টি জড়িত। আমাদের ধারণা, কাজটা করে লাল চিনের পা মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।’

‘এর মধ্যে যে নাক গলিয়েছেন, আপনাদের স্বার্থটা কী?’ জানতে চাইল রানা।

‘আমি ছোট মানুষ, বিশাল ভারতের স্বার্থ কতটুকু বুঝব, বলুন, হুজুর – থুক্কু, সার– আই রিপিট থুক্কু. মিস্টার রানা! আমাকে বলা হয়েছে অন্তত এই কেসটায় চিন আর বাংলাদেশকে পারলে সাহায্য করতে হবে। তাই ভাবছি আমার একবার মালয়েশিয়ায় যাওয়া দরকার।’

কিছু না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

‘আসলে যাচ্ছি কেলানটান রাজ্যের রাজধানী কোটা বাহারু-তে,’ বলল মানস। ‘মালয়েশিয়ার উত্তরে, সি রিসর্ট।’

‘সেখানে কী?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘বছর কয়েক আগে আমাদের সরকার থাই থান্ডারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে এসেছিল কোটা বাহারুর কাছাকাছি একটা নির্জন সৈকতে বসে। তখনই আমাদের মনে হয়েছিল, ওখানে ওদের বোধহয় গোপন কোনও আস্তানা আছে। আজ আমি একটা মেসেজ রিসিভ করেছি, ওই গ্যাং-এর একজনকে শহরে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।’

‘ভাল একটা সূত্র,’ বলল রানা, দেয়ালে ঝোলানো টেলিফোনের দিকে তাকাল। ‘ঠিক আছে, রানা এজেন্সির একজন এজেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিই, তারপর আপনার সঙ্গে বেরুনো যেতে পারে। এখানে এমন কিছু পেয়েছেন আপনি যা দেখে ওদের গন্তব্য বা অন্য কোনও সেফ হাউস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?’

‘নাহ্।’ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মানস। ‘আপনি

আপনার এজেন্টকে ফোন করুন। আমি বাথরুম থেকে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

মানস বাথরুমে ঢোকার পর দেয়াল থেকে ফোনের রিসিভার নামাল ও। থাইল্যান্ডের হাট খোয়াই, হোটেল নন্দনকাননের নম্বরে ডায়াল করছে। দু'বার রিঙ হতেই অপারেটর রিসিভার তুলল। লাবণীকে চাইল ও।

একটু পরেই লাবণীর স্যুইট নম্বরের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিল অপারেটর।

'রানা। রিপোর্ট করো।'

রানার গলা চিনতে পেরে উত্তেজিত হয়ে উঠল লাবণী। 'মাসুদ ভাই, আমার সেলফোনে এক লোকের কল পাবার অপেক্ষায় রয়েছি আমি,' দ্রুত বলল সে। 'লোকটা ফ্রি-লান্সার ইনফরমার, তবে বেশিরভাগ সময় থাই সিক্রেট সার্ভিসেরই কাজ করে। আমার সঙ্গে ব্যাংককে পরিচয় হয়েছিল। আমাকে এখানে দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে, একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানিয়েছে দুর্গ থেকে ফিরে আমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে।'

'গুড,' বলল রানা, লাবণীর উত্তেজিত বোধ করবার কারণটা বুঝতে পারছে। শত্রুপক্ষের অন্দরমহলে কী হচ্ছে না হচ্ছে জানার সুযোগ হবে তার। 'আর সব খবর বলো।'

এবার ধীরে ধীরে রিপোর্ট করল লাবণী। 'মাসুদ ভাই, একা সবদিকে নজর রাখতে পারব না, তাই ব্যাংকক থেকে একজন অপারেটরকে আনিয়েছি। এদিকে দুর্গের নিরাপত্তা আরও কঠোর করেছে থাই টং। হ্যাঙ্গারটা মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। রানওয়ের চারদিকে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানও বসাচ্ছে ওরা। ভেতরে শ্বেতাঙ্গ লোকজনের আসা-যাওয়া আরও বেড়েছে, তাদের মধ্যে দুজন অন্তত ইউরোপের নামকরা বিজ্ঞানী।

হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে খুব সমস্যার মধ্যেই আছে তারা।'

'থাই সিক্রেট সার্ভিসের ভূমিকা?' জানতে চাইল রানা। 'কোনও পরিবর্তন লক্ষ করছ?

'না,' বলল লাবণী। 'আগের মতই অসহায় ওরা। সবই দেখছে, তবে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই...' কথার মাঝখানে হঠাৎ আবার একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল সে, '...মাসুদ ভাই, একটু অপেক্ষা করুন, ফোনটা এসেছে!'

'ঠিক আছে, লাইনে আছি আমি,' বলল রানা।

দুই মিনিটের নীরবতা। তারপর আবার লাইনে ফিরে এল লাবণী। 'মাসুদ ভাই, কোড!'

রানা বুঝল, গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য পেয়েছে লাবণী। পকেট থেকে পেন্সিল ও নোটবুক বের করল ও, তারপর রিসিভারে বলল, 'গো অ্যাহেড।'

শুরু করল লাবণী।

সংকেত ভাঙার কোড জানা থাকায় লাবণীর উচ্চারিত শব্দগুলো লেখার সময়ই তরজমা করে ফেলছে রানা: 'থাই টঙের নির্যাতনে সিঙ্গাপুরে মারা গেছে ধানাই ঠাকুর। মারা যাওয়ার আগে মুখ খোলে সে। বলে গেছে, বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে মালয়েশিয়ার কোটা বাহারুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

সাংকেতিক ভাষাতেই উত্তর দিল রানা; 'ওয়েল ডান, লাবণী। এখনই একটা কপ্টার চার্টার করো তুমি, ব্যাংকক হয়ে মালয়েশিয়ার কোটা বাহারুতে চলে এসো। হোটেল শেরাটনে উঠবে। আমিও আসছি ওখানে।'

ষোলো

পুব আকাশে ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছে। ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার স্পিডে কলাপাতা রঙের ঝকঝকে পোর্শটা পাশ কাটাচ্ছে কুয়ালালামপুরকে। ড্রাইভিং সিটে মাসুদ রানা। সারা রাত একাই গাড়ি চালাচ্ছে ও।

সিঙ্গাপুর থেকে কজওয়ে পার হয়ে মালয়েশিয়ায় ঢোকার সময় কাস্টমস চেক হয়েছে নামে মাত্র। ইমিগ্রেশনে নিজেদের আসল পরিচয়ই দিয়েছে ওরা, ফলে ঝামেলা কম পোহাতে হয়েছে।

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য একটা রেস্তোরাঁর সামনে থামল ওরা। ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দেওয়ার পর বাথরুমে গেল মানস, ফেরার সময় তাকে একটা পে বুদে ঢুকতে দেখল রানা। কার সঙ্গে কথা বলল কে জানে, ফিরল বেশ খানিক দেরি করে।

নিজের চেয়ারে বসে রানাকে বলল, 'একটা ঝামেলার কাজ সেরে এলাম, বুঝলেন না!'

'কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোটা বারুতে নামকরা ভারতীয় হোটেল আছে, তাজমহল,' বলল মানস। 'আমাদের জন্যে দুটো স্যুইট রিজার্ভ করলাম। এদিকে এলে ওখানেই উঠি আমি।'

অবাক হলো রানা। 'আমাকে না জিজ্ঞেস করেই?'

'না, মানে,' অপ্রতিভ হয়ে উঠল মানস, '...দাদা, তাতে কি কোনও সমস্যা হবে? আমি কিছু না ভেবেই...'

'আমাদের এজেন্টকে আমি বলেছি... ঠিক আছে, যা হবার হয়েছে। তাকে জানালেই হবে যে আমি তাজে উঠেছি।'

'দাদা, আপনি বললে রিজার্ভ এখনই ক্যানসেল করে দেয়া

যায়...’

‘না, তার দরকার নেই,’ মৃদু হেসে বলল রানা। ‘আমারও এখন ইচ্ছে করছে তাজে উঠতে।’

পাহাড় ও উঁচু-নিচু ঢাল পার হয়ে এই মুহূর্তে সমতলভূমিতে রয়েছে পোর্শে। গুনগুন করে পুরানো একটা হিন্দি গান গাইছে মানস: ‘হাম জিকে কিয়া করেঙ্গে যাব দিল হি টুট গ্যায়া...’

‘হৃদয়টা সত্যি সত্যি ভাঙেনি তো, মিস্টার মানস?’ জানতে চাইল রানা, তীরবেগে গাড়ি চালাচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল মানস। ‘থাক।’ জোর করে হাসল সে। তারপর বলল, ‘তারচেয়ে গাড়িটার বৈশিষ্ট্য একটু শোনা যাক। বুকলেটে টেকনিকাল ভাষায় কী সব লেখা রয়েছে বুঝলাম না। বড় কৌতূহল হচ্ছে।’

‘ওই বোতামে চাপ দিন,’ বলল রানা, আঙুল দিয়ে বোতামটা দেখাল।

ওয়ালনাট ড্যাশবোর্ডে বসানো লাল বোতামটার দিকে তাকাল মানস। ‘কী হবে?’ চোখে প্রচুর সন্দেহ, কিছুটা ভয়।

‘না টিপলে বুঝবেন কীভাবে?’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোতামটায় চাপ দিল মানস। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া চৌকো একটা সেমি-ট্র্যান্সপারেন্ট স্ক্রিন বেরিয়ে এল ওয়ালনাট ড্যাশবোর্ডের উপর। তাতে দু’সারিতে সাজানো রয়েছে কিছু শব্দ। প্রতিটি শব্দের পাশে রুপালি রঙের জ্বলজ্বলে একটা চৌকো দাগ রয়েছে।

জিনিসটা কী বোঝার জন্য সামনে ঝুঁকল মানস। ‘ব্যাখ্যা করুন, বুঝলেন না, হুজুর – থুক্কু, মিস্টার রানা!’ হাত বাড়াল সে।

‘ওটায় হাত না দেয়াই ভাল,’ সাবধান করল রানা। ‘এই

গাড়ি চলে মাইক্রোকমপিউটার সিস্টেমে। যেমন ধরুন, আমি যখন দরজায় তালা দিই, ওগুলো সত্যি সত্যি তালা দেয়া হয় – আমি ছাড়া আর কেউ গাড়িতে চড়তে পারবে না। চাবিটা আমার সিস্টেমের সঙ্গে ইলেকট্রনিকালি সেনসিটাইজ্ করা আছে। ওই চাবির মাধ্যমে আমার বডি রিদম চিনতে পারবে কমপিউটার, ফলে অন্য কেউ কী হোলে চাবি ঢোকালে তালা খুলবে না ওটা। আবার যখন আমি ওই একই চাবি কী হোলে ঢোকাব, অমনি খুলে যাবে দরজা।'

'বাহ্, আজব তো!' প্রশংসা করল মানস। 'আর এই আশ্চর্য প্যানেলটা?' দ্বিগুণ উৎসাহে জানতে চাইল। 'এটার কী কাজ?' উত্তেজনায় ছাগলদাড়ি মোচড়াচ্ছে সে।

'ওটা কমপিউটার সিস্টেমেরই অংশ। প্রতিটি শব্দ একটা করে কমান্ড। আপনাকে শুধু ওগুলোর একটা স্পর্শ করতে হবে – চৌকো ঘর হোক, কিংবা পাশের শব্দ – সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন দেখতে পাবেন।'

'ঠিক কী ধরনের অ্যাকশন হতে পারে, মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করল মানস। ' স্রেফ কৌতূহল, বুঝলেন না!'

'ধরুন স্পাইক লেখা শব্দটা ছুঁলেন আপনি, ঠিক আছে? সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির পেছন থেকে পেরেকের মত দেখতে বিস্ফোরক ছড়িয়ে পড়বে রাস্তায়। খুব ভারী কিছু ওগুলোকে চাপা দিলে তবে ফাটবে। যে গাড়িই এটার পিছু নিক, সেটার টায়ার বলে কিছু থাকবে না।'

'মাইরি বলছি, সার, ভারি চমৎকার তো!'

'এবার পোর্ট ও স্টারবোর্ড,' বলল রানা, খেয়াল করল উৎসাহে চকচক করছে মানসের সরল চোখ দুটো, 'এই দুটো শব্দের ব্যাখ্যা দিই। দু'দিকের টায়ারের ওপর দুটো সাবমেশিন গানের কথা বলছে ওগুলো। ফেনডার পিছিয়ে যাবে, বেরিয়ে আসবে গান, ড্যাশ-এ উদয় হবে চারটে বুল'স-আই, চালক

যাতে গুলি করার জন্যে লক্ষ্যস্থির করতে পারে। কিংবা এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে কমপিউটার ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যও নেয়া যায়, হেয়ারলাইনে টার্গেট চলে এলে আমার হয়ে ওটাই ফায়ার করবে।'

সিটে হেলান দিল মানস। 'এত অবাক হচ্ছি যে মনে হচ্ছে চৈতন্য লোপ পাবে, সার – মিস্টার রানা! আর এই শব্দটা, এস্কেপ?'

'আমার খুব পছন্দের শব্দ ওটা,' বলল রানা। 'ঘণ্টায় নব্বুই মাইল স্পিডে ছুটছেন আপনি, তবে জানেন এটার স্পিড একশো বিশ পর্যন্ত তুলতে পারবেন। যে-ই পিছু নিয়ে থাকুক, আপনি চিন্তিত নন। হঠাৎ করে, আরও দুটো গাড়ি হাজির হলো আপনার সামনে। আপনি ফাঁদে পড়ে গেছেন। কী করবেন?'

'প্রার্থনা,' বলল মানস। 'মা দুর্গার দয়া চেয়ে প্রার্থনা। ইচ্ছে হলে তিনিই উদ্ধার করবেন।'

'না। আপনি আঙুল ছোঁয়াবেন এস্কেপ শব্দটায়, ওই সময় ওটাই আপনার দুর্গার পদতল, আর ওই স্পর্শই আপনার প্রার্থনা। কমপিউটারের সবগুলো ফাংশন কাজ শুরু করে দেবে। প্রতিরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে ওটা। আপনার চারপাশের তিনশো ষাট ডিগ্রি কাভার করবে – বারোটা বাজাবে নড়াচড়া করছে এমন যে-কোনও গাড়ির। মেশিন গান, স্মোক, পেরেক, গ্যাস – কিছুই ব্যবহার করতে বাকি রাখবে না। আরও আছে। টারবো জেট আপনাকে ঘণ্টায় তিনশো মাইল স্পিড পাইয়ে দেবে। সব মিলিয়ে, একটা ছোট আর্মির নেতৃত্ব চলে আসবে আপনার হাতে, তাদের সাহায্যে আপনি এস্কেপ, অর্থাৎ, পলায়ন করবেন।'

'নিশ্চয়ই বুলেটপ্রুফ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুধু বুলেটপ্রুফ নয়, বোমাপ্রুফও।'

একটা বোতামে চাপ দিল ও, স্ক্রিনটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এরকম একটা গাড়িতে বসে নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে হচ্ছে,' বলল মানস। 'বুঝলেন না!'

মৃদু হাসল রানা। জানে, এ-ধরনের গাড়ি ভারতও তৈরি করছে; কথাটা মানসের না জানার কথা নয়।

কুয়ালালামপুর থেকে কোটা বাহারু প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমটার দূরে, পৌঁছাতে বেশ বেলা হয়ে গেল। কোটা বাহারু পর্যটন শহর, কয়েক লাখ লোকের বাস, রাস্তায় রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম লেগে আছে। পৌঁছাতে দেরি হবে বুঝতে পেরে হোটেল শেরাটনে ফোন করল রানা, রিসেপশনকে জিজ্ঞেস করল লাবণী সামাদ নামে কোনও গেস্ট নাম রেজিস্ট্রি করেছে কি না।

করেছে। রানা জানতে চাইল, ফোনের লাইনটা লাবণীকে দেওয়া যায় কি না। উত্তর পেল, ঘণ্টা দুয়েক আগে হোটেলে নাম লিখিয়েই আবার বেরিয়ে গেছেন তাদের গেস্ট।

হোটেল তাজমহলে উঠল ওরা। হোটেলের কার পার্কিং-এ পোর্শ থেকে নামছে ওরা, শুনতে পেল কচি গলায় কেউ বলছে, 'মিস্টার! ও মিস্টার! আপনাদের কি গাইড দরকার?'

রানা ও মানস দুজনেই ঘুরে দাঁড়াল। নিচু পাঁচিলের ওপারে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা ছেলে উৎসাহের সঙ্গে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। বছর বারো বয়স হবে তার, পরিচ্ছন্ন হাফপ্যান্ট ও শার্ট পরে আছে।

'আমি খুব ভাল গাইড, সার! যেখানে বলবেন সেখানেই নিয়ে যাব। আমরা বিদেশি ট্যুরিস্টকে পছন্দ করি।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা। 'দুঃখিত, বন্ধু, আজ আমাদের গাইড দরকার নেই।' কয়েক পা হেঁটে গিয়ে দশ রিঙেত-এর একটা নোট পাঁচিলের মাথায় রাখল ও।

মানস বলল, 'রিজার্ভ তো করেছি, কিন্তু স্যুইটগুলো কোথায়

দেবে কে জানে। আমাদের স্যুইট টপ ফ্লোরে হলে ভাল হয়, পাশাপাশি।'

'পাশাপাশি কেন?'

কৃত্রিম সন্ত্রস্ত একটা ভাব নিয়ে চারদিকে চোখ বুলাল মানস। 'আমি বিপদে পড়লে আপনি যাতে সাহায্য করতে পারেন, বুঝলেন না!' গাড়ির দিকে পিছন ফিরে এগোচ্ছে ওরা, আবার ডাকল ছেলেটা।

'আমি খুব কম পয়সায় কাজ করি, মিস্টার,' বলল সে। 'আপনারা যা দেবেন। পাহাড়ের ওপর মন্দিরে নিয়ে যাব, হাতির পিঠে চড়াব, বোটে কোরে মাছ ধরতে নিয়ে যাব...'

'তোমাকে বললাম না আমাদের গাইড লাগবে না!' বলল রানা।

'ও। ঠিক আছে,' বলে পাঁচিলের মাথা থেকে নোটটা না নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল সে, আরেকদিকে চলে যাচ্ছে।

'এই, টাকাটা তোমাকে বকশিশ দিয়েছি।'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। হাঁটা থামায়নি। 'বকশিশ নিই না, সার।'

'এই থামো,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমাদের একটু ভুল হয়েছে। তোমাকে দিয়ে আমরা বোধহয় অন্য একটা কাজ করাতে পারি।'

সমর্থন করল মানস। 'দারুণ আইডিয়া!'

'আমরা একজনকে খুঁজছি,' বলল রানা।

'বলুন না, কে সে? দেখতে কেমন?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল ছেলেটা, চট করে একবার দেখে নিল পাঁচিলের মাথায় পড়ে থাকা নোটটা।

'মাথার চুল জুলফির কাছে একটা দুটো পাকা,' বলল রানা। 'আমার গায়ের রঙ। বাঙালী, শাড়ি পরেন। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা আছে। দেখলে মনে হবে এখুনি বুঝি ১৭-র নামতা বলতে

বলবেন। তবে তোমার ভয় নেই, তোমাকে অঙ্ক ধরবেন না। ভদ্রমহিলা কয়েকজন থাই লোকের সঙ্গে আছেন। ওদের কয়েকজনের নাম – চক্রি চুয়ান, হো টাকসিন, তাইম আনন্দ, ফিবান সংগত। চক্রি চুয়ানের ডান কপালের পাশে একটা লাল জরুল আছে। তবে আমরা চাই না, ওরা জানুক ওদের খুঁজছি – চমকে দিতে চাই আসলে, বুঝলে?'

পাঁচিলের মাথা থেকে টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরল ছেলেটা। 'এঁরা যদি এখানে থাকেন, আমি ঠিকই পেয়ে যাব।' ঘুরে ছুটল সে।

রিসেপশনে এসে খাতায় সই করল ওরা, তারপর যে যার স্যুইটের চাবি নিল। ওদের স্যুইটগুলো এগারোতলায়।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। আসবার পথে গাড়ি থামিয়ে কিছু কাপড়চোপড় কিনেছে, সেগুলো পরল। হোটেলে ঢুকেই একবার ফোন করেছে শেরাটনে, আবার ফোন করল লাবণীর স্যুইটে। ফেরেনি সে।

রানা ভাবল, লাবণী কি কোনও সূত্র পেয়েছে? ও কোটা বাহারুতে আসছে জানে সে, তারপরেও হোটেলে না থাকার কী কারণ থাকতে পারে!

মানসকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে তাজের একটা রেস্তোরাঁয় চলে এল রানা, পাঁচতলায় সেটা।

লং ড্রাইভের পর দুজনেরই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। বেশ সময় নিয়ে খাচ্ছে ওরা। শুরু করবার খানিক পর একটা মোবাইল রিসিভার নিয়ে এল ওয়েটার, রানার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার ফোন, সার। হোটেল শেরাটন থেকে।'

রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যালো?'

'মাসুদ ভাই, আমি ফিরেছি,' লাবণীর পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, একটু যেন উত্তেজিত। 'একটা জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলাম...'

'তুমি খেয়েছ?' জানতে চাইল রানা, ফোনে কাজের কথা নিয়ে আলাপ করতে চাইছে না।

'হ্যাঁ, বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।'

'ক'তলায় তুমি? স্যুইট নাম্বার বলো।'

'সেকেন্ড ফ্লোর, একশো এক,' বলল লাবণী।

'অপেক্ষা করো,' বলল রানা। 'লাঞ্চ শেষ করেই আসছি আমি।' রিসিভারটা ট্রেতে রাখল রানা। 'ধন্যবাদ।'

'আপনার এজেন্ট তা হলে অবশেষে পৌঁছেছেন?' জিজ্ঞেস করল মানস।

'হ্যাঁ।'

'কোটা বাহারুতে আগে কখনও এসেছেন আপনি?' ফ্রায়েড শ্রিম্প চিবাতে চিবাতে জানতে চাইল মানস।

'কয়েকবার,' বলল রানা। 'এখান থেকে দক্ষিণে খ্রিশ্চান জেলেদের কয়েকটা গ্রাম আছে, ছবির মত সুন্দর। ওরা দেশী মদ তৈরি করে, বিক্রির জন্যে নয়, নিজেদের জন্যে। খুবই ভাল।'

'তা হলে তো একবার সময় করে যেতেই হয় ওখানে।' রুমালে মুখ মুছে চেয়ারে হেলান দিল মানস, তৃপ্তির সঙ্গে হাত বুলাচ্ছে দাড়িতে।

টেবিল পরিষ্কার করবার পর কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। নিজের কাপ শেষ করে বিল মেটাল রানা।

মানস বলল, 'আপনি তো এখন আপনার এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন শেরাটনে। আমি ব্যস্ত থাকব ফোন নিয়ে, কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঠিক আছে, দাদা, বিকেলে দেখা হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিল ছাড়ল রানা, মানসের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে।

এলিভেটরে চড়ে নীচে নামল ও। তাজ থেকে বেরিয়ে এসে

দু-আড়াইশো গজে হেঁটে চলে এল হোটেল শেরাটনে। রিসেপশনিস্টকে খুব ব্যস্ত দেখে লবিতে থামল না ও, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে।

তিনতলায়, সিঁড়ির পাশের স্যুইটটাই একশো এক নম্বর। করিডরে এখনও ওঠেনি, ল্যান্ডিঙেই রয়েছে, দরজায় ১০১ লেখা দেখে নক করতে যাচ্ছে ও। হঠাৎ কবাট একটু ফাঁক মনে হলো। চাপ দিতে দেখল খুলে যাচ্ছে। স্যুইটের ভিতর থেকে খসখসে আওয়াজ ভেসে আসছে।

ওর জন্য খুলে রেখেছে লাবণী?

ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে কবাটটা পুরোপুরি খুলে ফেলল রানা। স্যুইটের অপরদিকে কোথাও আরেকটা দরজা আস্তে করে বন্ধ হলো। ও ভাবল, স্যুইটে ঢোকার জন্য করিডরের দিকে আরেকটা দরজা আছে?

দ্রুত ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা, পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা। এটা লিভিং রুম। পাশেরটাই বেডরুম। দোরগোড়া থেকে লাবণীকে দেখতে পেল ও।

চেয়ারে কাত হয়ে বসে রয়েছে লাবণী, পিঠের বাম দিকে একটা ছোরার কারুকাজ করা হাতলটাই শুধু বেরিয়ে আছে বাইরে।

[প্রথম খণ্ড শেষ]